ঐতিহ্যায়ন

রজত জয়ন্তী বক্তৃতা
ও
অন্যান্য প্রবন্ধ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

ঐতিহ্যায়ন

রজত জয়ন্তী বক্তৃতা
ও
অন্যান্য প্রবন্ধ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

Professor Mohammad Zahidur Rahman

ঐতিহ্যায়ন

রজত জয়ন্তী বক্তৃতা
ও
অন্যান্য প্রবন্ধ

শামসুল হোসাইন
সম্পাদিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

জানুয়ারি ২০০৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের রজত জয়ন্তী উদ্‌যাপন পরিষদের পক্ষে
আহ্বায়ক প্রফেসর মোকাদ্দেসুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত
এবং অ্যাডপ্রেস, রাজাপুকুর লেইন, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম থেকে মুদ্রিত।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ / ৭
প্রসঙ্গকথা / ৯
সম্পাদকীয় / ১১

রজত জয়ন্তী বক্তৃতা
এ. বি. এম. হোসেন ◻ বাংলাদেশের স্থাপত্য : অতীত ও বর্তমান / ১৫

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে উপস্থাপিত বিভিন্ন সেমিনার প্রবন্ধ
আনিসুজ্জামান ◻ জাদুঘরে কেন যাবো / ২৫
কে. এম. নূরুল হুদা ◻ "জাদুঘরে কেন যাবো" প্রবন্ধের উপর আলোচনা / ৩০
ইমরান হোসেন ◻ উচ্চতর মানববিদ্যা চর্চা : বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গবেষণা-উপাদান সংরক্ষণের গুরুত্ব / ৩১
গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া ◻ "উচ্চতর মানববিদ্যা চর্চা : বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গবেষণা-উপাদান সংরক্ষণের গুরুত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধের উপর আলোচনা / ৩৪
মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর ◻ অডিও ভিস্যুয়াল মাধ্যমে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ / ৩৭
Vasant Chowdhury ◻ Hitherto Unknown Harikela Coins - Some Analytical Comments / ৪৩
শামসুল হোসাইন ◻ "Hitherto Unknown Harikela Coins - Some Analytical Comments" শীর্ষক প্রবন্ধের উপর আলোচনা / ৫০

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন বিষয়ক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
আবুল ফজল ◻ উপাচার্যের ভাষণ / ৫৭

স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
শামসুল হোসাইন ◻ স্বাগত ভাষণ / ৬৩
আবদুল করিম ◻ সূচনা ভাষণ / ৬৬
সিরাজুল হক ◻ উদ্বোধনী ভাষণ / ৭১
রফিকুল ইসলাম চৌধুরী ◻ সভাপতির ভাষণ / ৭৪

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস বক্তৃতা
আবদুল করিম ◻ নলিনীকান্ত ভট্টশালী : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন / ৭৯

মুখবন্ধ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন বক্তৃতা এবং এর আগে ও পরে জাদুঘরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পঠিত অপ্রকাশিত কিছু প্রবন্ধ সংকলন আকারে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক সাংস্কৃতিক নিদর্শনাদি সংরক্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই মহতী দায়িত্ব পালনে একটি জাদুঘর স্থাপন করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সীমিত সাধ্যে নানা কার্যক্রম গ্রহণ করছে। আশা করি, এ সংকলনটি বর্তমান প্রজন্মকে তাঁর শিকড়ের সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করবে।

এ. জে. এম. নুরুদ্দীন চৌধুরী
সভাপতি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ট্রাস্ট
ও
উপাচার্য
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রসঙ্গ কথা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের পঁচিশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে রজত জয়ন্তী বক্তৃতাসহ বিভিন্ন বিষয়ে চারটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গ রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এবং সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করেন। রজত জয়ন্তী কমিটি প্রবন্ধগুলো সংকলন আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাঙলা ভাষায় জাদুঘর বিষয়ক লেখা-লেখির সংখ্যা অপ্রতুল হওয়ায় কাজটি হাতে নেওয়া হলে দেখা যায় যে, ইতিপূর্বে জাদুঘরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত আরও কিছু বক্তৃতা অপ্রকাশিত রয়ে গেছে– যা এই সংকলনে যুক্ত হলে প্রকাশনাটির সৌকর্য বৃদ্ধি পাবে। জাদুঘরে প্রদত্ত কয়েকটি বক্তৃতার লিখিত রেকর্ড নেই। কোন কোন বক্তৃতা ইতিমধ্যে প্রবন্ধাকারে বিভিন্ন জার্নালে মুদ্রিত হয়ে গেছে। সেসব বক্তৃতা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এ সংকলনে দশটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আরও আছে প্রবন্ধের উপর আলোচনা। সংকলনটি প্রকাশে অনেক বিলম্ব হলেও সম্পাদনা ও ছাপাখানার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন জাদুঘরের উপ-কিউরেটর ও ইনচার্জ জনাব শামসুল হোসাইন। তাঁকে প্রুফ দেখার কাজে সহৃদয় সহায়তা করেছেন বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক। সংকলনটি জাদুঘরে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গের কাজে আসলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

মোকাদ্দেসুর রহমান
আহ্বায়ক
রজত জয়ন্তী কমিটি
ও
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকীয়

১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন যাত্রা শুরু করে প্রায় ত্রিশ বছর ছুঁতে চলেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর। অনেক গ্রহণের কাল পেরিয়ে নানা কর্মকাণ্ডে এগুতে এগুতে ভালবাসাও কম কুড়োয়নি এই প্রতিষ্ঠানটি। তার কিছু নমুনা ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খ্যাতনামা জ্ঞানীগুণীজনদের উপস্থিতিতে। প্রত্নপ্রেমী প্রাজ্ঞজনদের ভাষণে-বক্তৃতায়-প্রবন্ধপাঠে সেসব বিদ্বৎসভা ছিল বাঙময়। অতি অল্প সময়ের কার্যক্রমে এবং তুলনামূলক কম সংগ্রহ নিয়ে দেশের অন্যান্য বরিষ্ঠ জাদুঘরের তুলনায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চায় দেশ ও বিদেশের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাগুলোতে স্থান পেয়েছে – এ কম শ্লাঘার কথা নয়। আরও শ্লাঘার বিষয় হলো এর প্রতিষ্ঠাকালের বেশ কয়েকজন গুণী পৃষ্ঠপোষক তাঁদের রচনায় জাদুঘরটির সঙ্গে তাদের মমতার বন্ধনের কথা উল্লেখ করেছেন, প্রকাশ করেছেন প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে তাঁদের গৌরবের অনুভূতিকেও। এইসব সাধু চেতনা জাদুঘরটিকে সামনে এগুতে সাহায্য করেছে।

প্রত্যেক অগ্রসর জাতিই নিজ নিজ ঐতিহ্য ও ইতিহাসের নিদর্শন সযত্নে সংরক্ষণ করে। যে কোন দেশের সভ্যতার কুলীনতা ও সমৃদ্ধির পরিচয় মেলে তার প্রত্নসম্পদের প্রাচুর্যে। কোন একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ কতটুকু তা বুঝা যায় সাংস্কৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে তাদের আগ্রহ, আন্তরিকতা ও উদ্যোগের পরিমাপে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ ও মমতা জাগানো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিক্ষা ও গবেষণার উপাদান হিসেবেও প্রত্ন নিদর্শনের রয়েছে উপযোগিতা। সংকলিত ভাষণ, বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলোতে প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণের তাগিদের বিষয়টিই নানাভাবে আলোচিত হয়েছে।

শামসুল হোসাইন
উপ-কিউরেটর ও ইনচার্জ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর

রজত জয়ন্তী
বক্তৃতা

০৮ নভেম্বর ১৯৯৮
গ্রন্থাগার ও জাদুঘর মিলনায়তন

রজত জয়ন্তী বক্তা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এ. বি. এম. হোসেন চট্টগ্রামের পথে ঢাকা এলেও সড়ক অবরোধের কারণে চট্টগ্রামে পৌঁছতে না পারায় ব্যক্তিগতভাবে প্রবন্ধটি উপস্থাপন করতে পারেন নি।

রজত জয়ন্তীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমাগত অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশের স্থাপত্য : অতীত ও বর্তমান

এ. বি. এম. হোসেন

স্থাপত্য একটি দেশের প্রতিচ্ছবি। স্থাপত্য দেশকে পরিচিতি দেয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান – এই তিনটি বিষয় মানুষের জীবনধারণের অপরিহার্য অঙ্গ। স্থাপত্য শুধু বাসস্থান নয়, স্থাপত্য সামাজিক ক্রিয়াকর্মের মিলনস্থানও বটে। তবে সব ইমারতই স্থাপত্য নয়। যে ইমারতের নান্দনিক দিক নেই, যে ইমারত আবেগতাড়িত নয় সে ইমারত স্থাপত্য কর্ম বলে বিবেচিত হয় না। স্থাপত্যের শৈল্পিক দিক থাকবে, দিক-নির্দেশনা থাকবে, একটি নিজস্ব স্টাইল থাকবে। সেই নিজস্ব স্টাইল একটি দেশের সভ্যতার অন্যতম পরিচায়ক।

স্থাপত্যের সাথে ভাস্কর্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ক্লাসিকাল স্থাপত্য ভাস্কর্য ছাড়া অকল্পনীয়। ভাস্কর্য স্থাপত্যের অলংকরণ। এই অলংকরণের পরিধি ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়েছে। যুক্ত হয়েছে চিত্রকর্ম, মোজাইক, লিপিকর্ম ও কাঠের কাজ। তাই সমস্ত শিল্পকর্মই এক সময়ে স্থাপত্যের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে। স্থাপত্য এ জন্যই শিল্পকর্মের জননী। তাই অনেক ক্ষেত্রে স্থাপত্য নিজেই মিউজিয়ামের ভূমিকা পালন করে।

স্থাপত্য একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় স্বকীয়তা আছে। স্বকীয়তাই রীতি বা স্টাইল। এই স্টাইল হঠাৎ সৃষ্টি হয় না। অ্যাসিরীয় যুগে গম্বুজের সৃষ্টি হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। গ্রিক এবং অ্যাকিমেনীয় যুগে স্তম্ভ ও পেডিমেন্টের (পেডিমেন্ট গ্রিকদের নিজস্ব), হেলেনেস্টিক যুগে মিনারের। রোমান আমলে অর্ধবৃত্তাকৃতি খিলানের, পার্শীয় এবং সাসানীয় যুগে ভল্ট এবং ইওয়ানের। আর বাইজ্যান্টীয় যুগে প্যানডেনটিভের। ভারতীয় অবদান মূলত পাথর-কর্তন বা স্তম্ভ ও শিখরের রূপায়ণে। এই ধারাবাহিকতা নিয়েই আকর্ষণীয় স্থাপত্যকর্মের সৃষ্টি। ধারাবাহিকতা যেমন একদিকে আন্তর্জাতিকতার সৃষ্টি করে, অন্যদিকে আবার স্থানীয় উপাত্ত সংযোজিত হয়ে জাতীয়তার বিকাশও ঘটায়। স্থাপত্য তাই আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উভয়ই। পাশ্চাত্যের আন্তর্জাতিকতা মূলত গ্রেকো-রোমান সমন্বয়ে, আর প্রাচ্যের পারসিক এবং ভারতীয় মিশ্রণে।

বাংলাদেশের স্থাপত্যেও আন্তর্জাতিকতা এবং জাতীয়তার ব্যত্যয় ঘটে নি। প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য

উদাহরণ বিরল। পুণ্ড্রনগর (মহাস্থান) ও দেবপর্বতের (ময়নামতি) উদাহরণ মাটির নিচে চাপা পড়ে আছে। খননবিকৃত উদাহরণ থেকে তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এই ধারণার সাথে প্রশস্তিপত্রের বিশেষণ যেমন 'গগনচুম্বী', 'পর্বতসম' ইত্যাদির মিল আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে প্রশস্তিপত্র যখন লেখা হয়েছিল তখন এই সমস্ত ইমারত বিদ্যমান ছিল। পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহার, দেবপর্বতের শালবন বিহার বা আনন্দ বিহার দৃষ্টে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে এই ইমারত এককালে দেশের গৌরব বয়ে এনেছিল। একটি স্বকীয় স্টাইলের সৃষ্টি করেছিল। এই স্টাইল একদিকে যেমন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োজনের সাথে জড়িত, অন্যদিকে তেমনি দেশজ নির্মাণ উপকরণ ও অলংকরণ শিল্পের সুষমা মণ্ডিত। পলেস্তারাবিহীন ইট এবং নিজস্ব সামাজিক বিষয়বস্তুর সাথে জড়িত পোড়ামাটির ফলক বাংলার নিজস্ব সম্পদ।

বাংলার এই নিজস্ব উপকরণ পরবর্তীকালে সুলতানি আমলে বিনা দ্বিধায় গৃহীত হয়েছে। আরবীয় মুসলমানদের প্রাথমিক পর্যায়ে নিজস্ব কোন স্থাপত্য ঐতিহ্য ছিল না বিধায় তারা বিজিত দেশের ঐতিহ্য সহজেই গ্রহণ করেছে। বিজিত দেশের ইমারতের নকশা, স্থাপত্যের টেকনিক্যাল বিষয়বস্তু তারা আত্মস্থ করেছে। গ্রহণ করে নি শুধু ভাস্কর্য-মূর্তি বা জীবন্ত প্রাণীর চিত্রায়িত রূপ। তবে এই বিধিনিষেধ ধর্মীয় ইমারতের বেলায় প্রযোজ্য হলেও লোকালয় হতে দূরে প্রাসাদে বা হাম্মামের বেলায় অগ্রহণযোগ্য হয় নি। সাধারণভাবে ধর্মীয় ইমারতের অলংকরণ বিমূর্ত করে ইসলামীকরণ করা হয়েছে। এই ইসলামীকরণ প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে আরবি লিপি কুরআনের বাণী বা হাদিস এবং জ্যামিতিক নকশাকে একত্রে বুনে এমন নকশার সৃষ্টি করা হয়েছে যা অভিনব। এই অভিনব নকশার নামকরণ শিল্প-ঐতিহাসিকগণ করেছেন 'এরাবেস্ক'। এই এরাবেস্ক ইসলামি স্থাপত্যের একটি পরিচয়-চিহ্ন।

বাংলা স্থাপত্যেও ইসলামীকরণের কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ধর্মীয় স্থাপত্যে যেমন মসজিদে বা সমাধি সৌধে ইসলামি ঐতিহ্যবাহী নকশা অনুকরণ করা হয়েছে। তবে জলবায়ুর তারতম্য ভেদে অসুবিধাজনক বৈশিষ্ট্যসমূহকে বাদ দেয়া হয়েছে। যেমন মসজিদ গৃহের সম্মুখের পাকা চত্বর বা তাকে বেষ্টিত বারান্দা। তবে মনে রাখতে হবে, এই পাকা চত্বর এবং বারান্দা মুসলমানদের নিজস্ব অবদান বলে স্বীকৃত নয়। মূলত এগুলো রোমান। রোমানদের মন্দির থেকে তাদের আত্মীকরণ করা হয়েছে। বাংলার মসজিদে আত্মীকৃত অন্যান্য উপকরণের মধ্যে রয়েছে গির্জার ট্রান্সসেপ্ট। তবে এই ট্রান্সসেপ্টের ছাদ প্রাথমিকভাবে পারসিক পদ্ধতিতে করা হলেও পরবর্তীকালে তা বাংলার চৌচালা ছাদে রূপান্তরিত করা হয়েছে। এই চৌচালা ছাদের সাথে সাথে চৌচালা বা দোচালা ছাদের ধনুক বক্রতা কার্নিসে গৃহীত হয়েছে। এর সাথে বাঁশের খুঁটির পরিবর্তে ইমারতের কোণে গিটযুক্ত বুরুজ, দেয়ালে বাঁশ-বেতের প্যানেল নকশার নির্মিতরূপ সংযুক্ত হয়েছে। সংযোজিত হয়েছে উল্টো গামলারূপী গম্বুজ। বাংলার এই নিজস্ব ডিজাইন উপকরণ অন্যান্য দেশের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের মতো সংযোজিত হয়ে একদিকে যেমন স্থাপত্যকে ইসলামীকরণ করেছে অন্যদিকে তেমনি আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে নিজস্ব রূপের সংযোজনও করা হয়েছে। এই আন্তর্জাতিক এবং স্বকীয় রূপ নিয়েই বাংলার সুলতানি স্থাপত্য। বাংলার সুলতানি স্থাপত্যই বাংলার নিজস্ব স্টাইল – বাংলা রীতি। এই রীতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা স্পষ্ট। স্থাপত্যের এই বিশিষ্টতা জাতীয়তাবাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সংযোজিত হয়ে পরবর্তীকালে রূপ নিয়েছে বাংলা রেনেসাঁ। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকৃষ্ট রূপ।

সুলতানি স্থাপত্যের পরবর্তীকালে ইতিহাসের ধারা অনুসারে স্থাপত্যের যে যুগ আসে তা মোগল যুগ। এই মোগল যুগ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এক ধরনের উপনিবেশিকতার সৃষ্টি করে। এই যুগে বাংলা স্থাপত্যের লয় হয় এবং ধীরে ধীরে পতন ঘটে। বাংলার সুলতানগণ স্বাধীন ছিলেন। দিল্লি থেকে আলাদা হয়ে তারা 'শাহি বাঙালা' স্থাপন করেন। তারা অনেকে খলিফা উপাধি ধারণ করেছিলেন। শাহি বাঙালাতে তারা গৌরব বোধ করতেন, এবং এই গৌরব থেকে বাংলার স্বকীয়তা এবং স্বাধীনতা বজায় রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। মোগলগণ ঠিক তার বিপরীত। তারা ইম্পেরিয়েল পাদিশাহ। তাদের রাজধানী উত্তর ভারতের আগ্রা, ফতেহপুর সিক্রি, দিল্লি এবং লাহোরে। তারা বাংলার সুলতানদের পরাস্ত করে বাংলাকে প্রদেশে রূপান্তরিত করেছিলেন। তাই বাংলায় মোগল আমলে যে স্থাপত্য হয়েছে তা প্রাদেশিক। বাংলার প্রাদেশিক মোগল স্থাপত্য। সুবাদার নির্মিত এই স্থাপত্য উত্তর ভারতের মোগল স্থাপত্যের ক্ষুদ্র রূপ। আয়তনে ক্ষুদ্রাকৃতির, ব্যয়ে সস্তা। মাল-মসলা অবশ্য বাংলাদেশের। বাংলার নগ্ন ইট বর্তমানে পলেস্তারা আচ্ছাদিত। বক্রছাদ সমান্তরাল ছাদে রূপান্তরিত। দ্বিকেন্দ্রিক খিলান চতুর্কেন্দ্রিক খিলানে পরিবর্তিত। প্রধান প্রবেশপথ পারসিক ইওয়ান আকারে নির্মিত। উল্টানো-গামলা গম্বুজের পরিবর্তে উন্নমিত অর্ধবৃত্তাকৃতি বা কিঞ্চিৎ বাল্‌বাস গম্বুজ। টেরাকোটা অলংকরণের পরিবর্তে সাদাসিধে পলেস্তারা আবরণ বা মাঝে-মধ্যে আয়তাকৃতি বা বর্গাকৃতি প্যানেল। স্বাধীন সুলতানি রাজবংশের ইতিহাস দু'শ বছরের উর্ধ্বের, মোগলদেরও অনেকটা তা-ই। সময়ের প্রেক্ষাপটে বাংলার মোগল স্থাপত্য ক্রমান্বয়ে সুলতানি স্থাপত্যের স্থান দখল করে এবং দীর্ঘ দুশো বছরের বেশি সময় অতিক্রমণের ফলে এই স্থাপত্যই দেশজ স্থাপত্যে গৃহীত হয়। মোগল স্থাপত্যের রূপ অথচ মোগল স্থাপত্য থেকে আলাদা। এই স্থাপত্যে ঔপনিবেশিকতার ছোঁয়াচ থাকলেও কালের স্রোতে তা নতুন রূপে বাংলার নিজস্ব স্থাপত্য হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, অধুনা গ্রামে-গঞ্জে যে মসজিদ ব্যক্তিগত বা সামাজিক প্রচেষ্টায় নির্মিত হয় তা কিন্তু এই মোগল স্থাপত্যেরই প্রতিভূ।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ব্রিটিশ রাজ প্রতিষ্ঠার পর বাংলার লোকায়ত স্থাপত্যে আবার নতুনত্ব দেখা দেয়। ধর্মীয় স্থাপত্য অপরিবর্তিত থাকলেও অফিস, আদালত, শিক্ষা ও বাসগৃহে পাশ্চাত্য স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। মোগল স্থাপত্যের সাথে এই স্থাপত্যের পার্থক্য হলো যেখানে মোগলগণ তাদের নিজস্ব রীতি সম্পূর্ণভাবেই চাপিয়ে দেয়, ইংরেজগণ সেখানে পাশ্চাত্য ও মোগল ধারায় নতুনত্বের সৃষ্টি করে। উপনিবেশ স্থাপন করতে এসে তারা বুঝতে পারে এদেশের ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করতে চাইলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্য আবহাওয়ার স্থাপত্য এদেশে চলবে না। তাই মিশ্র স্থাপত্য তৈরি করলে এ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে যেমন একদিকে সম্মান দেখানো হবে, অন্যদিকে তাদের নিজস্ব ভাবধারারও অনুপ্রবেশ ঘটানো যাবে। তাতে নতুন স্টাইলেরও সৃষ্টি হবে।

এই ধারাবাহিকতায় এতদিনের স্থাপত্য ঐতিহ্যের সাথে স্থাপত্যের পাশ্চাত্য যে বৈশিষ্ট্য বাংলায় প্রবেশ করে তাদের মধ্যে রয়েছে গ্রেকো-রোমান স্তম্ভ, পেডিমেন্ট, অর্ধবৃত্তাকৃতি খিলান এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁ রীতির উন্নম্ব গম্বুজ। ইমারতের প্রকারে এসেম্বলি হলের সৃষ্টিও এই নতুনত্বের অবদান। বাংলার প্রাদেশিক মোগল ও ইউরোপীয় ভাবধারায় বর্তমানে যে স্থাপত্যের সৃষ্টি হয় তার নামকরণ করা যায় বাংলার ইন্দো-ব্রিটিশ স্টাইল। এই স্টাইল দিল্লির ইন্দো-ব্রিটিশ স্টাইল থেকে কিছুটা ভিন্ন। দিল্লির স্টাইলে হিন্দু-বৌদ্ধ, মোগল এবং পাশ্চাত্য বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। কিন্তু বাংলায় বিশেষ করে পূর্ব বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে ঘটেছে মোগল এবং পাশ্চাত্যের মিশ্রণ। হিন্দু জমিদারদের বাসগৃহ বা প্রাসাদের বেলায় এই স্থাপত্য পাশ্চাত্য প্রাসাদেরই বিশেষ অনুসরণ।

বাংলার স্থাপত্য তাই ব্রিটিশ যুগ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিকতার ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যে একদিকে যেমন দেশজ উপকরণ আছে, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের বিশেষত্ব আছে। তবে এই

আন্তর্জাতিকতার মাঝে স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলার যে নিজস্ব শৈলীর বিশেষ প্রয়োগ ঘটেছিল তাই-ই বাংলা স্থাপত্যকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল।

১৯৪৭ সনে ভারত বিভক্তির পর বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তানে রূপান্তরিত হয়। জাতীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায় জাতীয় প্ল্যানিং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চালিত হতে থাকে। এই প্ল্যানিং-এ স্থাপত্য ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটে। বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের দিকে আর দৃকপাত করা হয় না। উত্তর ভারতীয় মোগল বৈশিষ্ট্যে দু'একটি ইমারত দৃষ্ট হলেও গৌরবময় ইসলামি স্থাপত্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কিন্তু সস্তায় গৌরব সৃষ্টি করা যায় না। ফলে বায়তুল মোকাররম বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ বা বিজ্ঞান ভবনের এনেক্সের মত সস্তা স্থাপত্য সৃষ্টি করা হয় যা স্থাপত্যে নতুন রীতি হিসেবে স্বীকৃতি পায় নি।

স্বাধীনতা লাভের পর স্থাপত্যে স্বাধীনতার প্রতিফলন ঘটবে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু তা এখনো ঘটে নি। কারণগুলি বিভিন্নভাবে অনুধাবন করা যায়। প্রথমত, ভারত বিভক্তির পর যে সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয় তার শিকার হয় পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ। যে কোন পেশাই তার বিকাশের জন্য পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন হয়। স্থাপত্যে সে পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। ফলে ঐতিহ্যবাহী নির্মাণ কারিগর শ্রেণী অদৃশ্য হয়ে যায়। একটি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, পেশা শিক্ষা হিসেবে স্থাপত্য বিদ্যা আমাদের দেশে নতুন। দেশের স্থপতি যারা বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত তারা স্থাপত্যের নতুন ধারায় বিশ্বাসী। এই নতুন ধারা যান্ত্রিক (mechanised), হস্ত শিল্প (hand made) থেকে ভিন্ন। ঐতিহ্যবাহী ধারায় নতুনত্ব সৃষ্টি করতে হলে ঐতিহ্য এবং নতুনত্বের সমন্বয় প্রয়োজন। সে গবেষণাটি আমাদের দেশে এখনো চালু হয় নি বলে আমার ধারণা।

সম্প্রতি স্থপতিদের মধ্যে এই নতুন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটছে বলে অনুমান করছি। কয়েক মাস পূর্বে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত 'বাংলাদেশের স্থাপত্য, পুরনগর থেকে শেরে বাংলা নগর' শীর্ষক যে আলোকচিত্রের প্রদর্শনী হয় এবং যা পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় স্থপতিগণ নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। কিছুদিন পূর্বে ঢাকার রাতের বাজারের শহিদ স্মৃতি নির্মাণ পরিকল্পনায় স্থপতিবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ইমারতে ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা অলংকরণ প্রয়োগের যে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তাতেও অনুরূপ চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। গত মাসের ১২ তারিখে ঢাকাস্থ ব্রিটিশ কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত স্থাপত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন উদ্যোক্তাদের (young enterpreneurs) গোল টেবিল বৈঠকে অনুরূপ আভাস পাওয়া যায়। মহামান্য রাষ্ট্রপতি একই মাসের ১৬ তারিখে 'ঢাকা শহরের সমস্যা ও সমন্বিত প্রয়াস' শীর্ষক যে সেমিনারের উদ্বোধন করেন তাতেও একই ধারার আলোচনা ব্যক্ত হয়েছে।

একটি দেশের স্থাপত্যকর্মকে সাধারণত চার ভাগ করা যায় : ১. জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইমারত, ২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ইমারত, ৩. ব্যবসা সংক্রান্ত ইমারত এবং ৪. আবাসিক গৃহ। এসবের মধ্যে ব্যবসা সম্পর্কিত ইমারতের একটি ধারা লক্ষ করা যায়। এটি হাই-রাইজ বা বহুতল বিশিষ্ট ইমারত। এই ইমারতে দেশজ নতুনত্ব কিছু নেই। স্টিল, রি-ইনফোর্সড কংক্রিট বা কাচ নির্মিত এই সমস্ত ইমারত পাশ্চাত্যের অনুকরণ। পাশ্চাত্যের এই ইমারতেও বিভিন্নতা আছে, আছে আর্ট। কিন্তু ঢাকার মতিঝিল বা দিলখোশার বহুতল ইমারতে দু'একটি উদাহরণ ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন আর্ট বা সুসামঞ্জস্য আছে এমন মনে হয় কি? কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার আলোকে নির্মিত এয়ারপোর্টের নিকটস্থ বিমান ভবনটি একটি ব্যতিক্রম বলে অনুভূত হয়। এটি এককভাবে ভালো হয়েছে মনে করি। গেটের দু'দিকে দুটি ক্ষুদ্রাকারের তোরণঘর নির্মাণ করে স্থপতি তার বিচক্ষণতা ও শৈল্পিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ইমারতসমূহে সাধারণভাবে স্থাপত্যের কোন প্রতিষ্ঠানিকতা লক্ষ করা যায় না। প্রত্যেকটি এক একটি একক (individual) ইমারত। পারিপার্শ্বিকতার সাথে তাদের সম্পর্ক কম। রকমের দিক থেকে প্রত্যেকটি আলাদা। ব্র্যাকের ট্রেনিং সেন্টারসমূহে যে টাইলের দোচালা ছাদ বিশিষ্ট একটি সনাক্তকারী ইমারত সৃষ্টি করা হয়েছে তা ব্যতিক্রম এবং আশা-ব্যঞ্জক। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশে আগমনের কয়েক বৎসরের মধ্যেই শিক্ষা, প্রশাসন বা বিচার বিভাগের ইমারতের মধ্যে একটি প্রাতিষ্ঠানিকতা লক্ষ করা যায়। তাতে ভারতীয় স্থাপত্যের ধারাবাহিকতায় নতুন বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য লক্ষণীয়। প্রত্যেকটি ইমারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তবে এই বিশিষ্টতা সামগ্রিক পরিকল্পনার আওতাধীন। উদাহরণস্বরূপ রাজশাহী কলেজ বা রংপুরস্থ কারমাইকেল কলেজের নাম করা যায়।

প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় ইমারতসমূহেরও একই অবস্থা। আমাদের অনেক 'ভবন' আছে। তবে প্রত্যেকটি ভবনের স্থাপত্য প্রকৃতি আলাদা। দেখে এগুলোকে আপিসও ভাবা যায় আবার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানও বলা যায়। সামষ্টিক স্বকীয়তা নেই। হাইকোর্ট বিল্ডিংটি একটু আলাদা। তাতে মোগল খিলান ব্যবহৃত হয়েছে, গম্বুজে পাশ্চাত্যের উন্নতা আছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, এই ইমারতের পারিপার্শ্বিকতা রক্ষা করা হয়েছে। পাশে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের বাড়ি, কার্জন হল থাকায় স্থপতি এই পারিপার্শ্বিকতার কথা মনে রেখেছেন।

বাসগৃহের বেলায় অনেকটা নৈরাজ্য। ব্যক্তি স্বাধীনতা এ ক্ষেত্রে এত বেশি যে তাতে কোন শৃঙ্খলা নেই। স্থাপত্যের নান্দনিকত্ব তাতে ক্ষুণ্ন। ব্যষ্টিক পর্যায়ে অনেক সুন্দর ইমারত ঢাকায় লক্ষ করা যায়। তাতে দেশজ উপাদানও আছে। কিন্তু সামঞ্জস্যের এতই অভাব যে, সেই সুন্দর ইমারতকেও অনেক সময় পারিপার্শ্বিকতার অভাবে অসহায় বলে মনে হয়। ঢাকার ধানমন্ডি, গুলশান, বনানী বা বারিধারা পরিকল্পিত আবাসিক এলাকা। কিন্তু সেই পরিকল্পনার মধ্যেও নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এখানেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা সামগ্রিক মূল্যবোধকে হার মানায়। একই রাস্তায় একতলা, দোতলা, বহুতলা বা হাই-রাইজ বিল্ডিং। কোনটা সম্মুখে, কোনটা পশ্চাতে, আবার কোনটা পার্শ্বে এবং পিলারের উপর। কোনটার উন্মুক্ত অঙ্গন আছে, কোনটার পার্শ্বে ইঞ্চি জমিও নেই। রাজউকের কাজ দেখে মনে হয় দালানের নক্শা ঠিক আছে কিনা তাই দেখা তাদের বিশেষ কাজ। পরিকল্পনায় পারিপার্শ্বিকতা বা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা অবশ্যই এ কাজের অন্তর্ভুক্ত। সম্প্রতি আবাসিক এলাকায় হাই-রাইজ বিল্ডিং সামগ্রিক বন্দোবস্তে (infrastructure) আরো সমস্যার সৃষ্টি করছে। হাই-রাইজ বিল্ডিং এসোসিয়েশনের সভাপতি অক্টোবরের ১২ তারিখের গোল টেবিল বৈঠকে আবাসিক হাই-রাইজ বিল্ডিং-এর প্রতি ক্রেতাদের অনুৎসাহের কথা উল্লেখ করেছেন। সমস্যা বেড়েই চলেছে। এই সমস্যা সমাধানের যেন কোন পন্থা নেই।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইমারতসমূহের অবস্থান কিছুটা আশাব্যঞ্জক হলেও তার কয়েকটিতে জাতীয়তার ছাপ লক্ষ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ তিনটি ইমারতের কথা উল্লেখ করব। প্রথমটি জাতীয় সংসদ ভবন। বিখ্যাত স্থপতি লুই কান্হ কর্তৃক পরিকল্পিত এই ইমারত বিশালতা ও নতুনত্বের দিক থেকে অতুলনীয়। পাশে পলেস্তারাবিহীন ইটের সংশ্লিষ্ট ইমারত নির্মাণ করে, লেক খনন করে, বৃক্ষ রোপণ করে ও সর্বোপরি ভবনের দক্ষিণ ও উত্তরে বিরাট প্লাজার ব্যবস্থা করে একটি সুন্দর পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করেছেন। নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি আদর্শ মডেল। কিন্তু ভবনটির দিকে লক্ষ করলে এটিকে আমাদের ইতিহাসের ধারাবাহিকতার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। বাইরের দিক থেকে প্রথম দর্শনে একে ইউরোপের মধ্যযুগীয় একটি ক্যাসেল বলে অনুমান করা যায়। পার্থক্য এই ভবনে উর্ধ্বগত কনিক্যাল টাওয়ারের ব্যবস্থা নেই। তবে এই টাওয়ারের পরিবর্তে ভবনের চতুর্দিকে যে ত্রিকোণাকার উন্মুক্ত জানালার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তাতে ইউরোপীয় প্রভাবই

লক্ষ করা যায়। বাংলা স্থাপত্যের কোন উপকরণ তাতে সংযোজিত হলে ভবনটি নতুনত্বে, বিরাটত্বে ও বৈশিষ্ট্যে জাতীয় ইমারতের আদর্শরূপ বলে পরিগণিত হতে পারতো। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ আমাদের দু'টি জাতীয় সৌধের কথা উল্লেখ করা যায়। একটি শহিদ মিনার ও অপরটি জাতীয় স্মৃতিসৌধ। প্রথমটি ঠিক স্থাপত্যকর্ম নয়। বিমূর্ত ঐতিহ্যবাহী মিনার, স্থাপত্যের সাথে তার সম্পর্ক নেই। তবে ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত পাঁচটি স্তম্ভ সর্দল কাঠামোতে নির্মিত এই ইমারত বাঙালি জাতিকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে তাতে ধারাবাহিকতা ব্যতিরেকেও এটি একটি জাতীয় ইমারতে পরিগণিত হয়েছে। এই পরিচিতির পেছনে রয়েছে আবেগ এবং আবেগ প্রথমেই উল্লেখ করেছি স্থাপত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতীয় স্মৃতিসৌধটিও তদ্রূপ। এটিও ঠিক ট্রাডিশন্যাল মিনারাকৃতির নয়। ক্রম অগ্রসরমান ও লম্বিত সাতটি স্থাপত্য ডানায় নির্মিত এই ইমারতটি দৃশ্যে নতুন এবং স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে নির্মিত। দুটি ইমারতেই স্থাপত্য কৌশলে বৈদেশিক কোন প্রভাব নেই, ধারাবাহিকতা নেই। স্থানীয় শিল্পীদের দ্বারা নিজস্ব চেতনায় নির্মিত বলেই তারা জাতীয় ইমারত। শিল্পী হামিদুর রহমান ও স্থপতি মঈনুল হোসেনকে সাধুবাদ জানাই। সংসদ ভবনের সংশ্লিষ্ট ইমারতসমূহের কথায় আবার আসা যাক। ইমারতসমূহ বাংলার ঐতিহ্যবাহী পলেস্তারাবিহীন ইটে নির্মিত হলেও বৃত্তাকৃতি বৃহদায়তন জানালাসমূহ স্থানীয় আবহাওয়ার পরিপন্থী। এই স্থাপত্যের স্টাইল পরবর্তীকালে কোন প্রভাব ফেলেছে এমন মনে হয় না।

দ্বিতীয় ইমারতটি জাতীয় জাদুঘর। এই সৌধে ঐতিহ্যবাহী জাতীয়তার কোন ছাপ নেই, আবেগও নেই। বাস্তবতার নিরিখে প্রস্তুসম্পদ রক্ষার্থে এটি একটি বৃহদাকারের সাধারণ ইমারত। স্থপতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন আভ্যন্তরীণ স্পেইসের (space) দিকে। তাতে তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবে যেহেতু মিউজিয়ম, ইতিহাসের ধারাবাহিকতার নিদর্শন রক্ষণের গৃহ, তাই তাতে ঐতিহ্যবাহী ছাপ থাকা বাঞ্ছনীয় ছিল।

তৃতীয়টি নগর ভবন। এই বিরাট ভবনেও জাতীয়তার ছাপ আছে এমন বলা যাবে না। স্থাপত্যকর্মে সুন্দর এই ইমারতটিতে ঐতিহাসিক ঢাকা স্থাপত্যের কোন উপকরণ যেমন দোচালা বৈশিষ্ট্যের উপযুক্ত প্রয়োগ থাকলে ভালো হতো বলে মনে হয়। হস্ত নির্মিত স্থাপত্যকর্ম যে যান্ত্রিক স্থাপত্যেও ব্যবহার করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ঢাকার এডুকেশন এক্সটেনশন সেন্টারের দোচালা মসজিদটি। গ্রিক স্থপতি আলেকজান্ডার ডক্সিয়াডিস্ যে অপরূপভাবে এই মসজিদের ছাদের ডিজাইন করেছেন তা অনুসরণীয়। মোগল আমলে নির্মিত বাংলার দোচালা ছাদ এক সময়ে যে সীমান্ত অতিক্রম করে দিল্লি এবং লাহোর, এমনকি পাশ্চাত্য স্থাপত্যে প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রধান কারণ এর নান্দনিক বৈশিষ্ট্য।

উপসংহারে এসে বলা যায় যে বাংলাদেশের স্থাপত্য ইতিহাসের দুটি অংশ, একটি প্রারম্ভিক ইতিহাস থেকে ভারত বিভক্তি পর্যন্ত যখন স্থাপত্যের ধারাবাহিকতা এবং ঐতিহ্য রক্ষিত হয়েছে এবং অপরটি ১৯৪৭ থেকে চলমান সময় পর্যন্ত যখন ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েছে। ধারাবাহিকতায় স্থাপত্যের গ্রামার থাকে, কিন্তু সেই গ্রামার বা শৃঙ্খলার সূত্রপাত বাংলাদেশে এখনো হয় নি। আমার ধারণা স্থপতিবৃন্দ চেষ্টা করছেন কিন্তু এখনো দিক-নির্দেশনা খুঁজে পান নি। ঐতিহ্যবাহী হস্তনির্মিত স্থাপত্য থেকে যান্ত্রিক স্থাপত্যে হঠাৎ প্রবেশের জন্য এই সংকট। ঐতিহ্যবাহী স্থপতি বা তখনকার ভাষায় 'ওস্তাগারে'র পতন এবং আধুনিক পাশ্চাত্য যান্ত্রিক স্থাপত্যে শিক্ষিত আমাদের স্থপতিবৃন্দের হঠাৎ নতুনত্বে প্রবেশ এই সংকটের মূল কারণ। সময়ের দিক থেকে এই নতুন কালের বয়স মাত্র অর্ধশতাব্দী। তার মধ্যেও আবার দুটি সময়– একটি পাকিস্তানি এবং অপরটি স্বাধীন বাংলাদেশের।

গত ২৮ বছরই আমাদের নিজস্ব সময়। স্থাপত্যের গতিশীলতা সৃষ্টিতে এ সময় নিতান্তই কম। তবে চেতনা আছে এবং উপযুক্ত যুগোপযোগী গবেষণায় তা ফলপ্রসূ হবে বিশ্বাস করি। স্থাপত্য একটি একক বিষয় নয়। তার সাথে সম্পৃক্ত শিল্পকলার ইতিহাস, নগর পরিকল্পনা এবং পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। এ সমন্বয় হলেই স্থাপত্য পলিসি নির্ধারণ সম্ভব। পলিসি হলে শৃঙ্খলা আসবে। যে স্থাপত্য-জঙ্গল এতদিনে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যে সৃষ্টি হয়েছে তার অবসান হবে। স্থাপত্যে সত্ত্বাধিকারীর ইচ্ছা অবশ্যই থাকবে, তবে সেই ইচ্ছা স্থপতি এবং পরিকল্পনাকারীর পেশাকে ছাড়িয়ে যাবে না। আজকাল প্রায়শই বাসস্থান নির্মাণে গ্রিক স্তম্ভের সস্তা অনুকরণ লক্ষ করা যায়। তার সাথে যখন আবার কৌণিক বিলানের সংমিশ্রণ দেখা যায়, তখনই মনে হয় স্থপতি সম্ভবত সত্ত্বাধিকারীর ইচ্ছায় স্থাপত্য-শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করেছেন। স্তম্ভ, পেডিমেন্ট, গম্বুজ, ইওয়ান – এগুলো সাধারণভাবে বৃহদাকার পাবলিক বিল্ডিং এর বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্র বাসস্থানে এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ঢালাও প্রয়োগ বেমানান। আমরা চাই স্থাপত্য শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে স্থপতি নতুন গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হোক এবং নতুন দেশীয় স্থাপত্য স্টাইলের সৃষ্টি করুক। স্থাপত্য স্টাইল একটি দেশের পরিচায়ক, সভ্যতার মানদণ্ড - পূর্বেই বলেছি। আমরা পরিচয়ের সন্ধান চাই। বিশ্বের স্থাপত্যবৃক্ষে বাংলাদেশ একটি স্থান লাভ করুক – এই কামনা করি।

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে জাদুঘরে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করছেন
উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান, সঙ্গে প্রফেসর হেনরি গ্লাসি এবং মুদ্রাতত্ত্ববিদ বসন্ত চৌধুরী

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে উপস্থাপিত বিভিন্ন সেমিনার-প্রবন্ধ

জাদুঘর লবি ও মিলনায়তন

জাদুঘরে কেন যাবো

আনিসুজ্জামান

পঁচিশ বছর আগে যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর (সে-সময়ে যাদুঘর) প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমি এর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলাম। সেইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের জন্যে নিদর্শন-সংগ্রহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটিরও একজন সদস্য ছিলাম। বেশ কয়েক বছর ধরে এসব কর্তব্য পালন করেছি। এই জাদুঘরের সঙ্গে একটা মমতার বন্ধনে আমি জড়িত। জাদুঘরের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে এর কর্তৃপক্ষ যে আমাকে স্মরণ করেছেন, তার জন্যে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমাকে বলা হয়েছে 'জাদুঘরে কেন যাবো' এই বিষয়ে আজ এখানে কিছু বলতে। এটা সরাসরি প্রশ্ন হলে তার একটা জবাব হতে পারতো, 'শামসুল হোসাইনের সঙ্গে দেখা করতে, তবে আপনারা ভালো করে জানেন যে, 'কেন' শব্দটি প্রশ্নবাচক হলেও তার দ্যোতনা সব সময়ে প্রশ্নসূচক হয় না। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো?' – এই বাক্য আসলে প্রশ্নসূচক নয়, বিবৃতিমূলক। এখানে 'কেন যাবো'র অর্থ যাবো না বা যেতে চাই না। কিন্তু 'সে যাচ্ছে না কেন?'– এটা ঠিকই প্রশ্নসূচক বাক্য। আবার বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবলিনী যখন বলেন, 'আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম ত তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম ত মরিলাম না কেন?'– তখন তিনি যা করেন, তা প্রশ্ন নয়, খেদোক্তি। আরেক ধরনের বাক্যও বাহ্যত প্রশ্নসূচক, কিন্তু দ্যোতনার দিক থেকে তা কার্যকারণ-সম্পর্ক ব্যাখ্যার ভূমিকা মাত্র এবং তাই সেখানে জিজ্ঞাসা-চিহ্ন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। আপনারা লক্ষ্য করবেন, 'জাদুঘরে কেন যাবো'– এই শিরোনামে প্রশ্নবোধক চিহ্ন নেই।

বক্তৃতার বিষয়ে প্রশ্নবোধক চিহ্ন না থাকলেও এ-বিষয়ে বক্তার বলবার যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চয় প্রশ্ন আছে। পাশ্চাত্যদেশে জাদুঘরতত্ত্ব – মিউজিওলজি, মিউজিওগ্রাফি বা মিউজিয়াম স্টাডিজ – একটা স্বতন্ত্র বিদ্যায়তনিক বিষয় বা শৃঙ্খলা হিসেবে বিকশিত হওয়ার পরে জাদুঘর সম্পর্কে আমার মতো যদু-মধুর বলবার অধিকার লোপ পেয়ে গেছে। তবে এ-প্রসঙ্গে আরেকটা কথাও মনে হয়। আলেকজান্দ্রিয়ায় নাকি পৃথিবীর প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বা তার কাছাকাছি সময়ে – ঠিক নির্দিষ্ট করে বলতে পারছি না, আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না – কিন্তু এটুকু

দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, সে সময়ে জাদুঘরতত্ত্ববিদদের কেউ তার ধারে-কাছে ছিলেন না। কী প্রেরণা থেকে বিশেষজ্ঞ না হয়েও একজন মানুষ এমন একটা কাজ করেছিলেন এবং দর্শনার্থীরাই বা সেখানে কোন প্রত্যাশা নিয়ে যেতেন, তা আজ ভাববার বিষয়। পৃথিবীর এই প্রথম জাদুঘরে ছিল নিদর্শন-সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার, ছিল উদ্ভিদউদ্যান ও উন্মুক্ত চিড়িয়াখানা, তবে এটা নাকি ছিল মুখ্যত দর্শন-চর্চার কেন্দ্র। এ থেকে আমাদের মনে দুটি ধারণা জন্মে: জাদুঘর গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠাতার রুচিমাফিক, আর তার দর্শকেরা সেখানে যেতেন নিজের নিজের অভিপ্রায়-অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ অংশে, হয়তো কেউ কেউ ঘুরে ফিরে সর্বক্ষেত্রেই উপস্থিত হতেন।

কালক্রমে প্রাচীন জিনিসপত্র সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ছিল এবং সম্পন্ন ব্যক্তি বা পরিবারের উদ্‌যোগে তা সংগৃহীত হয়ে জাদুঘর গড়ার ভিত্তি রচনা করছিল। প্রাচ্যদেশেও এমন সংগ্রহের কথা অবিদিত ছিল না, তবে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পরে পাশ্চাত্যদেশে এ ধরনের প্রয়াস অনেক বৃদ্ধি পায়। এ রকম ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জাদুঘরে কখনো কখনো জনসাধারণ সামান্য প্রবেশমূল্য দিয়ে ঢুকতে পারতো বটে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সকলের জন্যে খোলা থাকতো না। রাজ-রাজড়ারা বা সামন্ত প্রভুরা যেসব সংগ্রহশালা গড়ে তুলতেন, তাতে থাকতো ওইসব মহদাশয়ের শক্তি, সম্পদ ও গৌরবের ঘোষণা। ষোল শতকের আগে যৌথ কিংবা নাগরিক সংস্থার উদ্‌যোগে জাদুঘর নির্মাণের চেষ্টা হয় নি। নবনির্মিত এসব জাদুঘরই জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত রাখবার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর রাজরাজড়ার সংগ্রহশালা বা প্রাসাদ জনসাধারণের জন্যে অবারিত হয় গণতন্ত্রের বিকাশের ফলে কিংবা বিপ্লবের সাফল্যে। ফরাসি বিপ্লবের পরে প্রজাতন্ত্রই সৃষ্টি করে ল্যুভ, উন্মোচিত হয় ভের্সাই প্রাসাদের দ্বার। রুশ বিপ্লবের পরে লেনিনগ্রাদের রাজপ্রাসাদে গড়ে ওঠে হার্মিতিয়ে। টাওয়ার অফ লন্ডনের মতো ঐতিহাসিক প্রাসাদ এবং তার সংগ্রহ যে সর্বজনের চক্ষুগ্রাহ্য হলো, তা বিপ্লবের না হলেও ক্রমবর্ধমান গণতন্ত্রায়ণের ফলে। ব্যক্তিগত সংগ্রহের অধিকারীরাও একসময়ে তা জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করার প্রেরণা বোধ করেন এবং কখনো কখনো এসব ব্যক্তিগত সংগ্রহের দায়িত্বভার রাষ্ট্র গ্রহণ করে তা সকলের গোচরীভূত করার ব্যবস্থা করে। সতেরো শতকে ব্রিটেনের প্রথম পাবলিক মিউজিয়ম গড়ে ওঠে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে – এখানকার অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়মের সৃষ্টি হয় পিতাপুত্র দুই ট্র্যাডেসান্ট এবং অ্যাশমোল – এই তিনজনের সংগ্রহ নিয়ে। আঠারো শতকে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম, তবে তার ভিত্তিও ছিল অপর তিনজনের সংগ্রহ – স্যার হ্যানস স্লোন, স্যার রবার্ট কটন ও আর্ল অফ অক্সফোর্ড রবার্ট হার্লির। এসব কথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং তার পরিবর্তন যে জাদুঘরের রূপকে বড় রকম প্রভাবান্বিত করে, সে-বিষয়টা তুলে ধরা। জাদুঘরে প্রবেশাধিকার না পেলে কিংবা নাগরিকদের জন্যে জাদুঘর গড়ে না উঠলে সেখানে যাওয়ার প্রশ্নই উঠত না,– 'কেন যাবো' সে চিন্তা তো অনেক দূরের বিষয়। এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলা যেতে পারে পুঁজিবাদের সমৃদ্ধি এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উনিশ শতকে জাদুঘরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোও তাদের উপনিবেশে জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করতে থাকে। তেমনি একদিকে শিল্পোন্নতি এবং অন্যদিকে উপনিবেশবাদের অবসানের ফলে বিশ শতকে জাদুঘর-স্থাপনার কাজটি দ্রুত এগিয়ে যায়, সদ্য স্বাধীন দেশগুলোও আত্মপরিচয়দানের প্রেরণায় নতুন নতুন জাদুঘর প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে, তার আগে আর দুটি কথা বলি। একালে আলেকজান্দ্রিয়ার মতো মেলানো-মেশানো জাদুঘরের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত বোধহয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম। সেখানে বৃহৎ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক সংগ্রহশালার সঙ্গে রয়েছে বিশাল গ্রন্থাগার; স্বতন্ত্রভাবে রয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞান ও জীববিদ্যার জাদুঘর; রয়েছে নানা বিষয়ে অস্থায়ী প্রদর্শনী ও বক্তৃতার ব্যবস্থা। আর এসবের জন্যে প্রয়োজন হয়েছে প্রাসাদোপম অট্টালিকার। অভ্যাগতদের মধ্যে যিনি যেখানে যেতে চান, যা দেখতে চান ও জানতে চান, তিনি তা করতে পারেন। তবে এখনকার প্রবণতা হচ্ছে প্রাকৃতিক জগতের নিদর্শনের থেকে মানবসৃষ্ট নিদর্শন আলাদা করে রাখা, আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র নিয়ে ছোট-বড় জাদুঘর গড়ে তোলা। গত ত্রিশ বছরে ব্রিটেনে জাদুঘরের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে, যদিও ব্রিটিশ মিউজিয়মের সমতুল্য দ্বিতীয় কোনো জাদুঘর সে দেশে তৈরি হয় নি। জাদুঘরের বৈচিত্র্য আজ খুবই চোখে পড়ে – সে বৈচিত্র্য একদিকে যেমন সংগ্রহের বিষয়গত, তেমনি গঠনগত এবং অন্যদিকে প্রশাসনগত। আজ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জাদুঘর গড়ে তোলার চেষ্টাই প্রবল: প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, মানববিকাশ ও নৃতত্ত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, স্থানীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, সামরিক ইতিহাস, পরিবহন ব্যবস্থা, বিমানযাত্রা, মহাকাশ ভ্রমণ, পরিবেশ, কৃষি, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, শিল্পকলা – তারও আবার নানান বিভাগ-উপবিভাগ। কোনো ব্যক্তিবিশেষের জীবন ও সাধনা সম্পর্কিত জাদুঘর বহু দেশে বহু কাল ধরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে। মৎস্যাধার ও নক্ষত্রশালাও এখন জাদুঘর বলে বিবেচিত। জাদুঘর বলতে আজ আর ব্রিটিশ মিউজিয়ম, ল্যুভ বা হার্মিতিয়ের মতো বিশাল প্রাসাদ বোঝায় না। উন্মুক্ত জাদুঘর জিনিসটা এখন খুবই প্রচলিত। এমন কী, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনের একাংশে অবস্থিত হলেও জাদুঘরের গুরুত্ব হ্রাস পায় না। প্রশাসনের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র শ্রেণীর জাদুঘরের মধ্যে রয়েছে জাতীয় জাদুঘর, স্থানীয় বা আঞ্চলিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ও একান্ত বা ব্যক্তিগত উদ্‌যোগে গড়া জাদুঘর। আমাদের দেশ থেকে উদাহরণ নিলে বলব, এখানে যেমন আছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, তেমনি আছে চট্টগ্রামের জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘর, ঢাকার নগর জাদুঘর, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বিজ্ঞান জাদুঘর ও সামরিক জাদুঘর, রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়াম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর, ঢাকার বলদা গার্ডেন এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক খননের এলাকায় সাইট মিউজিয়ম। একজন কী দেখতে চান, তা স্থির করে কোথায় যাবেন, তা ঠিক করতে পারেন।

তবে জাদুঘরের একটা সাধারণ লক্ষণ হচ্ছে, যা চমকপ্রদ, যা অনন্য, যা লুপ্তপ্রায়, যা বিস্ময় উদ্রেককারী – এমন সব বস্তু সংগ্রহ করা। গড়পড়তা মানুষ তা দেখতে যায়, দেখে আপ্লুত হয়। এই প্রসঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। ঢাকায় আমাদের জাতীয় জাদুঘরের বর্তমান ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান। অনেক আমন্ত্রিতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিতান্ত কনিষ্ঠ শিক্ষক আমিও ছিলাম। লক্ষ্য করলাম, শিক্ষামন্ত্রী তাঁর ভাষণ পড়তে গিয়ে মুদ্রিত 'জাদুঘর' শব্দের জায়গায় সর্বত্র 'মিউজিয়ম' পড়ছেন। চা খাওয়ার সময়ে আমাদের শিক্ষকপ্রতিম অর্থমন্ত্রী ড. এম. এন. হুদা আমাকে ডাকলেন। কাছে যেতে বললেন, 'গভর্নর' সাহেবের একটা প্রশ্ন আছে, উত্তর দাও। গভর্নর জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিউজিয়মকে আপনারা জাদুঘর বলেন কেন?' একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, 'স্যার, জাদুঘরই মিউজিয়মের বাংলা প্রতিশব্দ।' গভর্নর এবার রাগতস্বরে বললেন, 'মিউজিয়মে যে আল্লাহ্‌র কালাম রাখা আছে, তা কি জাদু?' আল্লাহ্‌র কালাম বলতে তাঁর মনে বোধহয় ছিল চমৎকার তুঘরা হরফে লেখা নুসরত শাহের আশরাফপুর শিলালিপি – ষোল শতকে এক মসজিদ প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত সংবলিত প্রস্তরখণ্ড – সেটা রাখা হয়েছিল সকলের চোখে পড়ার মতো জায়গায়। যাহোক, গভর্নরের প্রশ্নের জবাবে আমি বললাম, 'স্যার, ওই অর্থে জাদু নয়, বিস্ময় জাগায় বলে জাদু – মা যেমন সন্তানকে বলেন, ওরে আমার জাদু রে।' ব্যাখ্যার পরের অংশটা যথার্থ কিনা, সে বিষয়ে এখন সন্দেহ হয়, তবে আমার বাক্য শেষ করার আগেই গভর্নর হুঙ্কার দিলেন, 'না, জাদুঘর বলা চলবে না, মিউজিয়ম বলতে হবে,

বাংলায়ও আপনারা মিউজিয়মই বলবেন।' তর্ক করা বৃথা – হুকুম শিরোধার্য করে আমার চান্সেলরের সামনে থেকে পালিয়ে এলাম। যঃ পলায়তে স জীবতি।

আরো একটা প্রবাদ আছে, চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। আমারও তাই হলো। গভর্নরের সামনে থেকে চলে আসার পরে মনে হলো, তাঁকে বললাম না কেন, জাদু শব্দটা ফারসি,– তাতে হয়তো তিনি কিছুটা স্বস্তি পেতেন। আপনারা অনেকেই জানেন, জাদুঘর পুরোটাই ফারসি, তবে জাদুঘরের ঘরটা বাংলা। উর্দুতে জাদুঘরকে বলে আজবখানা, হিব্রিতে অজাইব-ঘর। খানা ফারসি; আজব, আজিব, আজাইব আরবি। জাদু ও আজব শব্দে দ্যোতনা আছে দুরকম: একদিকে কুহক, ইন্দ্রজাল, ভেলকি; অন্যদিকে চমৎকার, মনোহর, কৌতূহলোদ্দীপক। 'আমার ছেলেকে সোজা পেয়ে মেয়েটা জাদু করেছে', আর 'কী জাদু বাংলা গানে!' – দু রকম দ্যোতনা প্রকাশ করে।

বয়সের দোষে এক কথা থেকে অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। মোনাহেম খান যে সেদিন রাগ করেছিলেন এবং জাদুঘরে অন্য অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও যে তিনি আল্লাহ্‌র কালামের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, এখন মনে হয়, তার একটা তাৎপর্য ছিল। তিনি দ্বিজাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাই জাদুঘরে সংরক্ষিত মুসলিম ঐতিহ্যমূলক নিদর্শন তাঁকে আকর্ষণ করেছিল এবং বাংলায় হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে জাদুঘরকে যেহেতু 'জাদুঘর' বলে, তাই তিনি সেটা বর্জন করে 'মিউজিয়ম' শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রয়োগ হিসেবে। জাদুঘরকে যদি তিনি আত্মপরিচয়লাভের ক্ষেত্র হিসেবে দেখে থাকেন, তাহলে মোটেই ভুল করেন নি। অল্প বয়সে আমি যখন প্রথম ঢাকা জাদুঘরে যাই, তখন আমিও একধরনের আত্মপরিচয়ের সূত্র সেখানে খুঁজে পাই – অতটা সচেতনভাবে না হলেও। বাংলার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের প্রাচীন নিদর্শনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। স্থাপত্যের নিদর্শন বলতে প্রধানত ছিল কাঠের ও পাথরের স্তম্ভ, আর ভাস্কর্য ছিল অজস্র ও নানা উপকরণে তৈরি। বঙ্গদেশে অত যে বৌদ্ধ মূর্তি আছে, সে সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না; পৌরাণিক-লৌকিক অত যে দেবদেবী আছে, তাও জানতাম না। মুদ্রা এবং অস্ত্রশস্ত্র দেখে বাংলায় মুসলিম-শাসন সম্পর্কে কিছু ধারণা হয়েছিল – ইসা খাঁর কামানের গায়ে বাংলা লেখা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। পোড়ামাটির কাজও ছিল কত বিচিত্র ও সুন্দর! জাদুঘরের বাইরে তখন রক্ষিত ছিল নীল জাল দেওয়ার মস্ত বড় কড়াই। নীল-আন্দোলনের ইতিহাস কিছুটা জানতাম। কড়াইয়ের বিশালত্ব চিত্তে স্তম্ভম জাগাবার মতো, কিন্তু তার সঙ্গে যে অনেক দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুবিন্দু জড়িত, সেটা মনে পড়তে ভুল হয় নি। ঢাকা জাদুঘরে যা দেখেছিলাম, তার কথা বলতে গেলে পরে দেখা নিদর্শনের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে পারে – কিন্তু বঙ্গের হাজার বছরের পুরোনো ইতিহাস ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির যে নমুনা সেখানে ছিল তা থেকে আমি বাঙালির আত্মপরিচয় লাভ করেছি। পরে তা শক্তিশালী হয়েছে কলকাতা জাদুঘর ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে।

পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহু জাদুঘরে আত্মপরিচয়জ্ঞাপনের এই চেষ্টা, নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখার যত্নকৃত প্রয়াস দেখেছি। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রেকো-রোমান মিউজিয়মে ও কায়রো মিউজিয়মে যেমন মিশরের পুরোনো ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে, সিয়াটলে ও নর্থ ক্যারোলাইনার পূর্ব প্রান্তে দেখেছি আমেরিকার আদিবাসীদের নানাবিধ অর্জনের নিদর্শন এবং ইউরোপীয় বসতিস্থাপনকারীদের প্রথম আগমনকালীন স্মৃতিচিহ্ন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম এবং টাওয়ার অত লন্ডনে ইংল্যান্ডের ইতিহাসের অনেকখানি ধরা আছে। কুয়েতের জাদুঘরে আমার ছেলেবেলায় দেখা ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রার সযত্ন স্থান দেখে চমৎকৃত হয়েছি; বুঝেছি, তাদের আত্মানুসন্ধান শুরু হয়েছে, কিন্তু দূর ইতিহাসের পাথুরে প্রমাণ হাতে আসে নি। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জাদুঘরের একটা প্রধান কাজ হলো সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং জাতিকে আত্মপরিচয়দানের সূত্র জানানো। জাদুঘরে আমাদের যাওয়ার এটা একটা কারণ। সে আত্মপরিচয়লাভ অনেক সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রিক পরিবর্তনেরও সূচনা করে।

টাওয়ার অত লন্ডনে সকলে ভিড় করে কোহিনুর দেখতে। আমিও তা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন আমার আরেকটা কথা মনে হয়েছিল। জাদুঘর হৃত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জায়গা বটে, তবে তা সবসময়ে নিজের জিনিস হবে, এমন কথা নেই। অন্যের ঐতিহ্যিক উত্তরাধিকার হরণ করে এনেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের জাদুঘর সাজাতে কুণ্ঠিত বোধ করে না।

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। ব্রিটিশ মিউজিয়মে নানা দেশের নানা নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে। কী উপায়ে সংগৃহীত হয়েছে, সেকথা আপাতত মুলতুবি রাখলাম। কিন্তু এসব দেখে অভিন্ন মানবসত্তার সন্ধান পাওয়া যায়। মনে হয়, এত দেশে এত কালে মানুষ যা কিছু করেছে, তার সবকিছুর মধ্যে আমি আছি।

জাতীয় জাদুঘর একটা জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। যে সেখানে যায়, সে তার নিজের ও জাতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে, সংস্কৃতির সন্ধান পায়, আত্মবিকাশের প্রেরণা লাভ করে। এই যে শত সহস্র বছর আগের সব জিনিস – যা হয়তো একদিন ব্যক্তির বা পরিবারের কুক্ষিগত ছিল – তাকে যে নিজের বলে ভাবতে পারি, তা কি কম কথা? আবার অন্য জাতির অনুরূপ কীর্তির সঙ্গে যখন আমি একাত্মতা অনুভব করি, তখন আমার উত্তরণ হয় বৃহত্তর মানবসমাজে।

জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি জোগায়, আমাদের চেতনা জাগ্রত করে, আমাদের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে। জাদুঘর একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠন। সমাজের এক স্তরে সঞ্চিত জ্ঞান তা ছড়িয়ে দেয় জনসমাজের সাধারণ স্তরে। গণতন্ত্রায়ণের পথও প্রশস্ত হয় এভাবে। জাদুঘর শুধু জ্ঞানই ছড়িয়ে দেয় না, অলক্ষ্যে ছড়িয়ে দেয় ভাবাদর্শ। কাজেই এ কথা বলা যেতে পারে যে, জাদুঘর যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবনার সৃষ্টি, তেমনি তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরও কারণ ঘটাতে পারে।

আরো একটা সোজা ব্যাপার আছে। জাদুঘর আমাদের আনন্দ দেয়। মানুষের অনন্ত উদ্ভাবনৈপুণ্য, তার নিরলস সৃষ্টিক্ষমতা, তার তন্নিষ্ঠ সৌন্দর্যসাধনা, তার নিজেকে বারংবার অতিক্রম করার প্রয়াস – এসবের সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমরা অশেষ উল্লসিত হই।

এতকিছুর পরেও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'জাদুঘরে কেন যাবো?', তাহলে তার একমাত্র উত্তর বোধহয় এই: 'কে বলছে আপনাকে যেতে?'

০৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮

জাদুঘরে কেন যাবো
প্রবন্ধের উপর আলোচনা

কে. এম. নূরুল হুদা

প্রবন্ধকার শ্রদ্ধেয় আনিস স্যার একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। প্রথমে তিনি বিষয়টির শিরোনাম নিয়ে মনোমুগ্ধকর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। 'জাদুঘরে কেন যাবো' এই শিরোনাম যে কোন প্রশ্ন নয়, আসলে তা কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যার ভূমিকা মাত্র – এ কথাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। এরপর জাদুঘর স্থাপনার ইতিহাস তিনি সুনিপুণভাবে উল্লেখ করেছেন। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রথম জাদুঘর থেকে শুরু করে ইউরোপের আধুনিক জাদুঘর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের জাদুঘরের ঐতিহাসিক পটভূমি সংক্ষেপে শুধু উল্লেখই করেন নি, সেই সাথে ঐ জাদুঘরসমূহের সাথে সমকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কও তুলে ধরেছেন। এসবের মাধ্যমে প্রবন্ধকার জাদুঘরকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস নিয়েছেন। জাদুঘর কী তা জানতে পারলে জাদুঘরে কেন যাবো তা' সহজে উপলব্ধি হবে – এই দৃষ্টিকোণে প্রবন্ধকারের ঐ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ।

আমাদের দেশের জাদুঘরে স্যারের চাকরি জীবনের প্রথমদিকের দু'একটি স্মৃতি তিনি লিখেছেন। তদানীন্তন গভর্নর সাহেবের জাদুঘর বিষয়ক অদ্ভুত ধারণাটির মাধ্যমে তিনি মূলত আমাদের মত দেশে জাদুঘর স্থাপনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার নির্দেশনাই করেছেন। তার পরপরই তিনি তাঁর কৈশোরে জাদুঘরে যাওয়ার স্মৃতি উল্লেখ করে এর মধ্য দিয়ে আত্মপরিচয় লাভের সুন্দর পর্যালোচনা করেছেন। জাদুঘরে মানুষ তার আত্মপরিচয় খুঁজে পায় – এই কথাটিতে প্রবন্ধকার বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং গোটা প্রবন্ধে তিনি তা একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ মিউজিয়মে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

শেষে তিনি বলেছেন – জাদুঘর আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের শক্তি জোগায়, আমাদের চেতনা জাগ্রত করে, আমাদের মনোজগৎকে সমৃদ্ধ করে। তিনি আরও লিখেছেন – জাদুঘর একটা শক্তিশালী সামাজিক সংগঠনও। একদিকে জাদুঘর যেমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবনার সৃষ্টি করে, একই সাথে তেমনি তা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনেরও কারণ ঘটাতে পারে। আমার মতে, স্যারের এই কথাগুলি জাদুঘরের সনাতনী সংজ্ঞার সবচেয়ে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত সংযোজন।

সবশেষে তিনি রসবোধ সম্পন্ন একটি উত্তর দিয়েছেন বিষয়টির শিরোনামের এই ভাবার্থে যে এত মূল্যবান, গুরুত্ব ও জীবন সম্পর্ক যে স্থানটিতে সেস্থানে না যেয়ে কি পারা যায়! আমার মতে, স্যারের প্রবন্ধটি জাদুঘর প্রত্যয়ের উপরে একটি অসাধারণ উপস্থাপনা হয়েছে, এর জন্য আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

উচ্চতর মানববিদ্যা চর্চা : বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গবেষণা-উপাদান সংরক্ষণের গুরুত্ব

ইমরান হোসেন

উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণাকে জ্ঞানার্জন ও বিদ্যাচর্চার উপযুক্ত, পরিশীলিত ও উন্নত পন্থা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। এই পন্থা আয়ত্ত করার সর্বোচ্চ স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে অত্যন্ত মুক্ত ও অনুকূল পরিবেশে জ্ঞানানুশীলন হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গের বৈষম্য করা হয় না। এখানে প্রবেশের মাপকাঠি হল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত কিছু শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শর্ত পূরণ – যা সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

বিরুৎ প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলেজ ও নিম্নস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত ও মানগত উৎকর্ষমূলক পার্থক্য রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য পি. জে. হারটগ এই প্রসঙ্গে যথার্থই বলেন :

> A man may be an excellent teacher of elementary subjects without the power to add to knowledge. But in advanced work I maintain that not one can really teach well unless he has the combination of imagination with critical power which leads to original, and for that, if for no other reason a university to be a true university must see that its teachers are men who are also capable of advanced knowledge.

বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন যেমন বড় তেমনি পাঠক্রম বিস্তৃত ও গভীর। পাঠদান, পাঠক্রম প্রণয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে এই প্রতিষ্ঠান। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষককে ছাত্র-ছাত্রীদের চলতি গবেষণার ফল, নতুন নতুন বিজ্ঞানের আবিষ্কার, তত্ত্ব ও তথ্য, জানা বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিচার-বিশ্লেষণ ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করতে হয়। অতএব, জ্ঞানের সমকালিক পর্যায় সম্পর্কে অবহিত হওয়া, বিদ্যাচর্চা, পদ্ধতির আধুনিকায়নের সঙ্গে সম্পৃক্তির এবং শিক্ষকদের যোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কাজ মূলত ত্রিমুখী - পাঠদান, পাঠক্রম প্রণয়ন ও গবেষণা পরিচালনা। উচ্চতর বিদ্যাচর্চার অপরিহার্য উপাদান গবেষণা। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্ন থেকেই এর কর্মকাণ্ডের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছে গবেষণা। সতের শতকের শেষপাদে ও আঠার শতকের প্রথমপাদে প্রতিষ্ঠিত জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রকৃত অর্থে আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমকে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত করে এবং উচ্চতর গবেষণাকে কর্মকাণ্ডের আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করে। ইউরোপ ও আমেরিকার বহু বিশ্ববিদ্যালয় এই সমস্ত জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়কে মডেল হিসাবে গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই গবেষণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ গবেষণার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনেও গবেষণাকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই আইনের ৪র্থ ক্লজে বলা হয় :

> to provide for instruction in such branches of learning as it may think fit, and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge.....

সূচনালগ্ন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশে ও বিদেশে উচ্চতর গবেষণার জন্য শিক্ষকদের কর্তব্যরত ছুটি আর্থিক মঞ্জুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই পি-এইচ.ডি. ও ডি.এস-সি. পর্যায়ে ডিগ্রি প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯২১ থেকে '৪৭ পর্যন্ত ৫৭ জন গবেষক পি-এইচ.ডি. ও ডি.এস-সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও শিক্ষক ও গবেষকদের জন্য দেশে ও বিদেশে উচ্চতর গবেষণা ও বিদ্যাচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় ছুটি, অর্থ মঞ্জুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আসছে। তবে দেশের অভ্যন্তরে, উল্লিখিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধীনে গবেষণা বা উচ্চতর জ্ঞানানুশীলনের জন্য গবেষণা-উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্ববহ। গবেষণার উপাদান ব্যতীত গবেষণা অচিন্ত্যনীয়। গবেষক মাত্রই জানেন যে, দেশে বসে গবেষণা-উপাদান পাওয়া কত কঠিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় বিজ্ঞান পরীক্ষাগার ও জাদুঘর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সাধারণত গবেষণা উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। মানবিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও জাদুঘর (বিজ্ঞানের বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত) সাধারণত ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের দিকে লক্ষ্য রেখে বই-পুস্তক, জার্নাল ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে, কোন কোন বিভাগীয় গ্রন্থাগারে দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ ও দলিলপত্র সংগ্রহ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ ব্যতীত সেমিনার গ্রন্থাগারগুলোকে গবেষণা-সহায়ক গ্রন্থাগার হিসাবে গড়ে তোলা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারই উচ্চতর গবেষণা ও বিদ্যাচর্চার উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা, সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রয়োজনীয় অর্থ-বরাদ্দ।

বিজ্ঞান সভ্যতাকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। উন্নত প্রযুক্তি আজ আমাদের দোড় গোড়ায়। কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, মাইক্রোফিল্ম প্রভৃতি উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বল্প সময়ে, কম খরচে উচ্চতর মানববিদ্যা চর্চার উপকরণ পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গবেষকদের প্রয়োজনীয় গবেষণা উপকরণ (Printed materials) সহজলভ্য করতে পারে যা কোন গবেষকের পক্ষে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরও বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণার মানববিদ্যা চর্চার উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জাদুঘরের কাজ হল : preservation and interpretation of society's cultural properties। গ্রন্থাগারের উপকরণের সঙ্গে জাদুঘরের উপকরণের স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। জাদুঘরের উপকরণ অকৃত্রিম, অদ্বিতীয় ও প্রত্যক্ষ (raw, unique & direct)। সৌভাগ্যের বিষয় হল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরাকীর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাধারণ শিক্ষামূলক (academic) জাদুঘর রয়েছে। বাংলাদেশের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ জাদুঘর নেই। প্রাচীন ইতিহাস পুনর্গঠন ও গৌরবময় অতীতকে জানার ক্ষেত্রে এই জাদুঘর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। এই জাদুঘরের সংগ্রহের মধ্যে আছে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, পুরাকীর্তি, প্রাচীন মুদ্রা, লিপিমালা, ভাস্কর্য, পোড়ামাটির কাজ, লোকশিল্পকর্ম, ব্যবহৃত পোশাক, গহনা, আসবাবপত্র ইত্যাদি। তাছাড়াও জাদুঘরের সঙ্গে রয়েছে একটি সহায়ক গ্রন্থাগার। এখানে আছে বহু দুষ্প্রাপ্য আরবি, উর্দু, ফার্সি, বাংলা পাণ্ডুলিপি, পুথি, প্রাচীন পত্রপত্রিকা, মূল্যবান গ্রন্থ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দুষ্প্রাপ্য দলিলপত্র। বিগত দু'হাজার বছরের ইতিহাসের নানা উপকরণ এর সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে।

শিক্ষামূলক (academic) জাদুঘর হওয়ার কারণে এর সংগ্রহ গড়ে তোলা হয়েছে শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি লক্ষ্য রেখে। সুতরাং বিদ্যার্থী, গবেষক, এই বিষয়ে উৎসাহী ব্যক্তি সকলেই এই জাদুঘর দ্বারা উপকৃত হবেন।

বিদেশের বিখ্যাত জাদুঘরসমূহের মত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর বিদ্যার্থী গবেষকদের সংরক্ষিত নিদর্শনসমূহের (object) পরিচিতি তালিকা, পরীক্ষার আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ এবং পাঠকক্ষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উচ্চতর মানববিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

শিক্ষার মান, শিক্ষকদের যোগ্যতা, উন্নত পাঠক্রম, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার-গবেষণাগার, জাদুঘর ও বিদ্যাচর্চার উপযুক্ত পরিবেশই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ও সুনামের চাবিকাঠি - অবশ্যই এর আয়তন ও চাকচিক্য নয়। অতএব, এই দিকে লক্ষ্য রেখে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গড়ে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

১০ ডিসেম্বর ১৯৯৮

উচ্চতর মানববিদ্যা চর্চা : বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গবেষণা-উপাদান সংরক্ষণের গুরুত্ব

প্রবন্ধের উপর আলোচনা

গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া

আলোচনার শুরুতে আমি প্রবন্ধকার ড. ইমরান হোসেনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁর প্রবন্ধের জন্য। প্রবন্ধটি সময়োপযোগী ও মননশীল। তাঁর প্রবন্ধে যে সব বৈশিষ্ট্য আমাকে আকৃষ্ট করেছে সেগুলো হলো : উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক মূল্যায়ন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা – পাঠদান, পাঠক্রম প্রণয়ন ও গবেষণা, শিক্ষকদের ভূমিকা, বর্তমান বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরকারি অর্থ মঞ্জুরি সহ সহায়তাপ্রদান, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গবেষণা-উপকরণ এবং অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে গবেষণা-উপকরণ সংরক্ষণ ইত্যাদি।

উচ্চতর মানববিদ্যা বলতে আমরা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীত মানবিক এবং সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহকে বুঝি। বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়সমূহ মানব কল্যাণে নিয়োজিত থাকলেও তার বেশির ভাগই ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক। আমাদের দেশ উন্নয়নশীল দেশসমূহের পর্যায়ে পড়লেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে। আমাদের সমাজ, সাহিত্য এবং ইতিহাস সম্পর্কিত উচ্চতর গবেষণা বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে চলমান থাকলেও তা নানা কারণে আড়ষ্ট হয়ে আছে। একটা সময় ছিল এদেশের গবেষকগণ লন্ডন পাড়ি জমাতেন এবং সেখানে সংরক্ষিত উপাদান ব্যবহার করে উচ্চতর গবেষণা সমাপ্ত করতেন। এই ক্ষেত্রে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম সবচেয়ে অগ্রণী। এখানে অষ্টাদশ শতক থেকে শুরু করে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ব্রিটিশ ভারতীয় রেকর্ডস সংরক্ষিত আছে। শুধু তাই নয় এদেশের পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে অখ্যাত, অজ্ঞাত লেখকের গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপিও এখানে সংরক্ষিত আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী প্রফেসর আনিসুজ্জামান ব্রিটিশ মিউজিয়মে সংরক্ষিত উপকরণ ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন যে, বাংলা গদ্যের জন্ম অষ্টাদশ শতকে। তাঁর মূল্যবান গবেষণা Factory Correspondance ব্যবহার করে নিশ্চিত হয়েছে। এদেশের বিভিন্ন বস্তু উৎপাদন কেন্দ্র যেগুলো আড়ং হিসেবে পরিচিত ছিল সেগুলো থেকে Dacca Factory-তে যে চিঠির আদান-প্রদান হতো সেগুলোকে প্রফেসর আনিসুজ্জামান বাংলা গদ্যের উদাহরণ হিসেবে প্রমান করেছেন।

উচ্চতর মানববিদ্যা চর্চায় গবেষণা উপাদানের বিকল্প কিছু নেই। বাংলাদেশের সরকারি মহাফেজ খানায় (Archive) রক্ষিত ভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন রেকর্ডস, সরকারি রিপোর্ট ও অন্যান্য নথিসমূহ অনেক গবেষকের নাগালের বাইরে। এই সকল উপাদান Microfilm করে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হতে পারে। এখানে আমার একটি উদ্যোগের কথা সবিনয়ে বলতে চাই। কয়েক বৎসর পূর্বে প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক জনাব শামসুল আলম ও জনাব আনিসুর রহমানের মাধ্যমে আমি চট্টগ্রাম কালেক্টরেট লাইব্রেরি থেকে ব্রিটিশ যুগের অনেক আদমশুমারি রিপোর্টের ফটোকপি সংগ্রহ করেছি। এই ক্ষেত্রে সে সময়ের অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি বিজ্ঞান, লোকপ্রশাসন, ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সভাপতিদের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করতে হয়। বর্তমানে চট্টগ্রাম কলেজ, কালেক্টরেট লাইব্রেরি, ভিক্টোরিয়া কলেজ, এম. সি. কলেজ ও বিভিন্ন কালেক্টরেটে রক্ষিত অন্যান্য গবেষণা-উপকরণসমূহ সংগ্রহ করার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এই সকল উপাদান অযত্নে, অবহেলায় প্রায় নষ্ট হওয়ার পথে। এই ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ভূমিকা নিতে পারে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের মত সমৃদ্ধশালী গ্রন্থাগার হয়ত গড়ে তোলা যাবে না। তা'সত্ত্বেও প্রতিবছর বিভিন্নভাবে সংযোজনের মাধ্যমে গড়ে তুলতে হবে সংগ্রহশালা। যে Collection হয়ত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ Rare Collection হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সমাজ বিজ্ঞান এবং মানববিদ্যার সঙ্গে যুক্ত এই সকল উপকরণ সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা যত তাড়াতাড়ি শুরু করা যায় ততই মঙ্গলকর হবে।

প্রবন্ধকার ড. ইমরান হোসেন তাঁর প্রবন্ধে উচ্চতর মানববিদ্যা সম্পর্কিত উপকরণাদি সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে যে বক্তব্য রেখেছেন সে জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ন্যাশনাল লাইব্রেরি কলকাতায় অবস্থিত। এ'ছাড়া নয়াদিল্লিতে বেশ কিছু গ্রন্থাগার রয়েছে যেখানে রয়েছে অপূর্ব সংগ্রহ যেগুলো উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণায় অবশ্যই প্রয়োজন। আমি প্রথমেই বলেছি যে, আমাদের দেশের গবেষকবৃন্দ প্রাথমিক উপাত্ত ব্যবহারের সুযোগ তেমন পান না। তাকে ছুটে যেতে হয় নিদেন পক্ষে ভারতে। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করা হয়েছে উনিশ শতকের বাংলা অঞ্চলের দুর্লভ গবেষণা উপকরণ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে এইসকল উপকরণ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ওইভাবে এই সকল উপকরণ সংরক্ষণের মাধ্যমে গবেষকদের সহায়তা প্রদান করতে পারে। পরিশেষে জাদুঘর কর্তৃপক্ষকে ও প্রবন্ধকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন
জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান, পাশে মুদ্রাতত্ত্ববিদ বসন্ত চৌধুরী

অডিও ভিস্যুয়াল মাধ্যমে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর

দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণের ব্যাপারে অন্য দশটি সভ্য ও কালচার্ড দেশের মতো আমাদের দেশে সচেতনতা নেই। সরকারের মধ্যে যেমন নেই, জনগণের মধ্যেও তেমন নেই। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন কিছু প্রচেষ্টা চোখে পড়ে। তা খুবই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ।

অনেকে বলতে পারেন, আমাদের দেশে এতো দারিদ্র্য ও সমস্যা, বেঁচে থাকার সংগ্রাম করতেই আমরা প্রাণান্ত। এই অবস্থায় ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণ তো দূরের কথা, ইতিহাসের কথা স্মরণ করারও সময় নেই।

একদিক থেকে কথাটি সত্য। দেশ হিসেবে আমাদের প্রধান অগ্রাধিকার দারিদ্র্য বিমোচন। সেই সংগ্রামে সফল হলেই আমরা অন্যান্য দিকে দৃষ্টি দিতে পারবো। যে ভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

কিন্তু দারিদ্র্য বিমোচনের এই সংগ্রামের মধ্যেও আমরা কম বিলাসিতা করছি না। সরকারিভাবে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বিপুল অঙ্কের টাকা ব্যয় হচ্ছে প্রতি অর্থ বছরে। অর্থাৎ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেও আমরা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পিছিয়ে নেই। সাম্প্রতিক কালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'উইল্‌স ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট' আয়োজন করে আমাদের সরকার যেভাবে অর্থ ব্যয় করেছে তাতে আমাদের ক্রীড়ানুরাগ শুধু দেশে নয়, বিদেশেও প্রচারিত হয়েছে।

সরকারের উদ্যোগে ঢাকায় 'সোনার বাংলা সংস্কৃতি বলয়' নামে বিশালাকারে সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্স তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

ফুটবল, ক্রিকেটসহ অন্যান্য ক্রীড়া ও গেম্‌সে আমাদের সাফল্য অনুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে দেখার মতো ক্ষুদ্র হলেও প্রতি বছর ক্রীড়া সেক্টরে আমাদের সরকারি ব্যয় খুব সামান্য নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, দেশের হাজার সমস্যা বা দারিদ্র্যের দোহাই দিয়ে আমরা খুব কম কাজই ফেলে রেখেছি। তাহলে ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রতি মুখ ফিরিয়ে রাখবো কোন যুক্তিতে?

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর আগ্রহ জন্মাতে পারতো পাঠ্য বই। প্রাইমারি পর্যায় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পাঠ্য বইতে যদি সচেতনভাবে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আকর্ষণীয় লেখা ও ছবি থাকতো তাহলে ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি এক ধরনের ভালোবাসা জন্মাতো। সেই ভালবাসাই একজন কিশোরকে এগিয়ে নিয়ে যেতো বিস্তৃততর ইতিহাস পাঠে। ইতিহাস পাঠ থেকে আসতো ইতিহাস সচেতনতা। শুধু স্বদেশের ইতিহাস নয়, বিদেশের বড় বড় বাঁক ফেরানো নানা ঘটনা জানার আগ্রহ জন্মাতো। পরিচিত হতো স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাসের মহানায়কদের কীর্তি-কাহিনীর সঙ্গে।

ইতিহাস পাঠ কোনো বিশেষ অনার্স ক্লাসের ছাত্রের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না। সেটা নৃবিজ্ঞান বা পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্য হতে পারে। ইতিহাস পাঠ সচেতন মানুষের কাছে প্রত্যাশিত। এবং এই পাঠের কোনো শেষ নেই। কারণ একদিকে ইতিহাস রচিত হচ্ছে প্রতিদিন, অপরদিকে পুরোনো ইতিহাসের নিত্যনতুন বিশ্লেষণ ও দলিল প্রকাশিত হচ্ছে। কাজেই ইতিহাসের কোনো অধ্যায়ের পাঠ সম্পর্কে ইতি টানার কোনো সুযোগ নেই।

ইতিহাস পাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করছি এ কারণে যে, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের কোনো তাগিদই সৃষ্টি হবে না ইতিহাস পাঠ না করলে। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে চট্টগ্রামের ভূমিকা জানা না থাকলে যে কোনো জেলা প্রশাসকের পক্ষে যতীন্দ্রমোহন সেনের স্মৃতিজড়িত 'জে এম সেন হল' ভেঙ্গে ফেলার হুকুম দেওয়া সম্ভব। সেজন্যেই ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশে সরকারি উদ্যোগে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের কোনো ব্যাপক উদ্যোগ দেখা যায় না। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুরাতত্ত্ব বিভাগ এ ব্যাপারে কিছু কাজ করেছে। কিন্তু তাদের বাৎসরিক বাজেট এতো কম যে, সেই টাকা দিয়ে প্রয়োজনীয় সব কাজ করা সম্ভব হয় না। ফলে ইতিহাসের স্মৃতিবিজড়িত ও আমাদের ঐতিহ্যের অংশভুক্ত অনেক ভবন শুধু অর্থাভাবে আজ সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। অনেক পুরাকীর্তি উদ্ধার করা যাচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন বাংলার রাজধানী 'সোনারগাঁ'র কথা বলা যায়। সোনারগাঁর ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলো আজ ধ্বংসের পথে। সংরক্ষণের কোনো উদ্যোগ নেই। স্থানীয় লোকেরা ইট খুলে খুলে নিয়ে যাচ্ছে। হয়তো আর দশ বছর পরে সোনারগাঁর কারুকাজখচিত সুদৃশ্য ঐতিহাসিক ভবনগুলোর অস্তিত্ব আর থাকবে না।

আমাদের দেশেই এটা সম্ভব হচ্ছে। ইউরোপ বা আমেরিকায় এটা কল্পনাও করা যায় না। এমনকি ভারতেও নয়।

ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করাকে আমাদের সরকার হয়তো অপব্যয় মনে করেন। আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি ও সংস্কৃতিমনস্কতার যে রূপ আমরা অহরহ দেখছি তাতে খুব ভরসা পাওয়া যায় না, অদূর ভবিষ্যতেও ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে সরকারি উদ্যোগ খুব ব্যাপকতা লাভ করবে। যদি মন্ত্রী ও সরকারি কর্মকর্তাদের চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পরিবর্তন আসে তবে আমরা নিশ্চয় সকলে খুশি হবো এবং আমরা সেরকম প্রত্যাশাও করবো।

এবার আসা যাক, আজকের মূল প্রসঙ্গে।

আগেই বলেছি, সরকারের পক্ষে বড় অঙ্কের বাজেট নিয়ে ইতিহাস, ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই বাস্তবতা আমাদের মেনে নিতে হবে। তাই তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম বাজেটের কথা এখন আমাদের ভাবতে হবে। এর সঙ্গে আরেকটি বাস্তবতা এসে যুক্ত হয়েছে তা হল: আমাদের তরুণ ও ছাত্র সমাজের মধ্যে বই বিমুখতা। সিলেবাস বহির্ভূত বই পাঠে অনেক তরুণের আগ্রহ কম। যেটুকু অভ্যাস এখনো রয়েছে তা প্রধানত উপন্যাস পাঠের মধ্যে সীমিত। অবশ্য সকল তরুণের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়।

শুধু তরুণ কেন, এখন অনেক মহিলা ও পুরুষের কাছে প্রধান বিনোদন হচ্ছে: টেলিভিশন। বিশেষ করে, বিভিন্ন স্যাটেলাইট চ্যানেল। ভিডিও ক্যাসেটে ফিল্ম দেখার একটা সংস্কৃতিও আমাদের সমাজে গড়ে উঠেছে। অডিও ক্যাসেটে গান শোনার আগ্রহও কম নয়।

আমরা এই অডিও-ভিস্যুয়াল প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে কিছুটা সহায়তা করতে পারি।

অডিও মাধ্যম

প্রথমে অডিও মাধ্যমের কথা বলা যাক।

আমাদের দেশে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা পুরোনো দিনের সাক্ষী। যাঁদের সামনে ইতিহাসের অনেক ঘটনা ঘটেছে। প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপচারিতা ক্যাসেটে রেকর্ড করে আমরা ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় ধরে রাখতে পারি। যা পরবর্তীকালে গবেষক, ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক বা লেখকের কাছে মূল্যবান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হবে। আমাদের সৌভাগ্য, ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন অনেকে এখনো জীবিত রয়েছেন। তাঁদের স্মৃতিকথা, ইতিহাসের কী অসামান্য উপাদান হতে পারে একবার ভেবে দেখুন।

'বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর' ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এরকম একটি মৌখিক ইতিহাস প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক নেতা, সেক্টর কমান্ডার, অগ্রণী মুক্তিযোদ্ধা, কূটনীতিবিদ– এরকম অনেকের সাক্ষাৎকার এই প্রকল্পে ধারণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটা একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

অডিও মাধ্যম ব্যবহার করে ইতিহাস সংরক্ষণের একটা সফল দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। এখন দরকার এরকম আরো প্রকল্প গ্রহণ করা ও ইতিহাসের নানা অধ্যায় রেকর্ড করা।

ইতিহাস বলতে আমরা যেন সবসময় রাজনৈতিক ইতিহাস না বুঝি। সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এরকম নানাভাবে ইতিহাসকে দেখা যেতে পারে। যেমন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নিয়েও একটা অডিও ইতিহাস প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা এসব কাজ করতে যত দেরি করবো ততোই ইতিহাসের সাক্ষীদের আমরা হারাতে থাকবো। তখন আমাদের সেকেন্ডারি ইনফরমেশন বা নানাজনের উদ্ধৃতি আর শোনা কথার উপর নির্ভর করে কাজ করতে হবে।

বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস গত পঁচিশ বছর ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে একটা আর্কাইভস গড়ে তুলেছে। সম্প্রতি 'হৃদয়ে একাত্তর' শিরোনামে একটি সিরিজ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার ধারণ ও প্রচার করা হয়েছে। ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসের কার্যক্রম প্রধানত সাংস্কৃতিক চেতনা থেকে উৎসারিত। কিন্তু সংরক্ষণের ব্যাপারে তারা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তা খুবই প্রশংসাযোগ্য। শুধু প্রচারের লক্ষ্যে নয়, সংরক্ষণের লক্ষ্যেই ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস কাজ করে যাচ্ছে।

অডিও মাধ্যমকে ইতিহাস রচনার একটা কার্যকর মাধ্যম হিসেবে আমি বিবেচনা করি।

ভিস্যুয়াল মাধ্যম

এবার আসা যাক ভিস্যুয়াল মাধ্যম সম্পর্কে।

টেলিভিশন ও ভিডিও আমাদের নাগরিক বিনোদনের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। টেলিভিশন ছাড়া আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ প্রায় অচল। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভিডিও। ভিডিওতে ক্যাসেট চালিয়ে মনপছন্দ ফিল্ম দেখাও আজ অনেকের বিনোদন। বিনোদনের পাশাপাশি আমরা টেলিভিশন ও ভিডিও মাধ্যমকে নানাভাবে ব্যবহার করতে পারি। ভিডিও প্রযুক্তি এখন আমাদের নাগালের মধ্যে। কাজেই এর আরো বৈচিত্রাময় ব্যবহারের কথা আমরা ভাবতে পারি।

আমরা আগেই স্বীকার করেছি, আমাদের সমাজ এখন বইমনস্ক নয়। তাই টেলিভিশন ও ভিডিও ব্যবহার করে আমরা কিশোর ও তরুণদের কীভাবে ইতিহাসমনস্ক করে তুলতে পারি তা নিয়ে আলোচনা করবো। তার আগে সংরক্ষণের বিষয়টা বলে নিই।

আমাদের দেশের ইতিহাস কম প্রাচীন নয়। নানা স্থান ও ভবনে ইতিহাসের চিহ্ন প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে সেই চিহ্ন মুছে যাচ্ছে। বিশেষ করে বর্তমান বহুতল আবাসিক ভবন ও অত্যাধুনিক সুপার মার্কেট নির্মাণের এই জোয়ারে রাজধানী ঢাকার অনেক চেনা দৃশ্যপটই বদলে যাচ্ছে। এর সঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহাসিক নানা ভবন। এই স্মৃতিচিহ্নগুলো পুরোপুরি হারিয়ে যাবার আগে আমরা যদি সুপরিকল্পিতভাবে ভিডিওতে ধারণ করতে পারি তাহলে অনাগত দিনের ইতিহাস সচেতন নাগরিকদের আমরা কিছু ধারণা অন্তত দিতে পারবো।

আর ইতিহাস জানার জন্যে বই পড়ার কষ্ট স্বীকার করতে যারা অনাগ্রহী তাদের জন্যেও ভিডিও ক্যাসেট একটা অবলম্বন হতে পারে।

এসব ভিডিও ছবি শুধু যে ইতিহাস কেন্দ্রিক হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। পরিচিতিমূলকও হতে পারে। ব্যক্তিত্ব কেন্দ্রিকও হতে পারে। যে পরিচালক যেভাবে বিষয়টি দেখতে চান।

প্রশ্ন উঠতে পারে কারা তৈরি করবে এই ফিল্ম?

খুব সঙ্গত প্রশ্ন। তার আগে দেখা যাক উদ্যোগ নেবে কে? আমার সরল বিবেচনায় মনে হয় জাদুঘর ধরনের প্রতিষ্ঠান বা পুরাতত্ত্ব বিভাগ উদ্যোগ নিলে ভালো হয়। বিষয়টা তারা বোঝেন ভালো। তবে অন্য কোনো সংস্থা বা ব্যক্তি যে উদ্যোগ নিতে পারবে না তা নয়। ইতিহাসবোধ ও গবেষণামনস্কতা থাকলে অনেকের পক্ষেই এই উদ্যোগ নেয়া সম্ভব।

এ ধরনের প্রকল্প সরকারি অনুদান ছাড়া বাস্তবায়ন প্রায় দুরূহ। তবে সরকারি অনুদান পাওয়া যাবে এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। তবে আংশিক অনুদানের জন্যে হলেও চেষ্টা করা যেতে পারে। এছাড়া বিদেশী সংস্থা, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও বিভিন্ন এনজিও'র কাছে অনুদান চাওয়া যেতে পারে। আরেকটা উপায় হচ্ছে: বহুজাতিক কোম্পানি বা বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে সহায়তা চাওয়া। এক একটা কোম্পানি যদি এক একটা ছবির ব্যয়ভার গ্রহণ করে তাহলে তা খুব কঠিন কাজ হবে না।

এ ধরনের ছবি তৈরির সময় বিশেষ একটা সতর্কতা দাবি করে। তা হল : ইতিহাসের বর্ণনায় বা বিশ্লেষণে যেন ইতিহাসবিদের বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখা হয়। কোনো দল বা ব্যক্তিকে প্রয়োজনের চাইতে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা ইতিহাসের ধর্ম নয়।

ইতিহাস বা ইতিহাস-আশ্রিত চরিত্রকে নিয়ে স্যার রিচার্ড এটেনবরোর বহুল প্রশংসিত 'গান্ধী' ছবিটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস না পড়লেও শুধু 'গান্ধী' ছবিটি দেখে ঐ সময়ের ইতিহাস সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করা যেতে পারে।

'গান্ধী' ছবি দেখে বহু বিদেশী দর্শক অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ভারতে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে নানা ইতিহাস গ্রন্থ পাঠে আগ্রহী হয়েছেন নিঃসন্দেহে। একটি সুনির্মিত ফিল্ম একটি প্রজন্মের মধ্যে ইতিহাস চেতনা কীভাবে জাগাতে পারে, 'গান্ধী' ছবিটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এছাড়া পাকিস্তানের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জীবন ও অবদান নিয়েও বিদেশে ছবি তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশে খান আতাউর রহমানের পরিচালনায় 'সিরাজউদ্দৌলা' ছবিটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

ইতিহাস-আশ্রিত বহু প্রামাণ্য ও ফিচার ছবি বিদেশে তৈরি হয়েছে। আমাদের অনেকের স্মৃতিতে সেই সব ছবি এখনো দীপ্যমান।

টেলিভিশন নাটক বা অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও ইতিহাস বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে দর্শকের কাছে তুলে ধরা যায়। যেমন, সাম্প্রতিককালে ভারতে নির্মিত ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত 'সোর্ড অব টিপু সুলতান', 'আকবর দা গ্রেট', 'মীর্জা গালিব', 'তানসেন', 'বাহাদুর' প্রভৃতি সিরিয়াল ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় ও চরিত্রকে প্রতিফলিত করেছে। যদিও উল্লেখিত ছবিগুলো নিছক ইতিহাস বর্ণনার জন্যে নির্মিত হয় নি।

আমাদের দেশেরও ইতিহাস ও ঐতিহাসিক চরিত্র রয়েছে। যাদের কথা আমরা এভাবে টিভি সিরিয়ালের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারি। বর্তমানে আমরা এমন একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ তৈরি করেছি যার ফলে 'মুক্তিযুদ্ধ' ছাড়া আর কোনো ইতিহাসের কথা আমাদের গণমাধ্যমে উচ্চারিত হয় না। তাও আবার বিভিন্ন সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসও বিভিন্ন রূপ লাভ করে। যদি বেতার ও টেলিভিশনকে অনুসরণ করে কোনো কিশোর বা তরুণ '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে চায়, তাহলে আমার সন্দেহ, তিনি খুবই বিভ্রান্তিতে পড়বেন। এই বিভ্রান্তি থেকে তাকে রক্ষা করা দরকার।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রস্তাব হচ্ছে : টেলিভিশনে 'ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক' একটি নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচার করা হোক। যার নেপথ্যে কাজ করবেন একদল ইতিহাসবিদ ও গবেষক। অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুধু দেশের নয় বিদেশেরও বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনা তুলে ধরা যেতে পারে। অনুষ্ঠানগুলো শুধু প্রচারেই সীমিত থাকবেনা। তা পরে ক্যাসেটে কপি করে বিক্রি করা যেতে পারে।

টিভি অনুষ্ঠান সম্পর্কে শুধু একটি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তা হচ্ছে : যোগ্য ও দক্ষ লোকদের হাতে অনুষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ। তা না হলে মূল উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। অনেক ভালো বিষয়ও অদক্ষ লোকের হাতে পড়ে অনাকর্ষণীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, বিটিভিতে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

সিডি রম

যোগাযোগ দুনিয়ায় সম্প্রতি নানা প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। তার একটি হল : সিডি রম। আমরা সিডি তথা কমপ্যাক্ট ডিস্কে অনেকে গান শুনে থাকি। কিন্তু সিডিকে আমরা ইতিহাস সংরক্ষণের জন্যেও ব্যবহার করতে পারি।

'সিডি রম' তথ্য ধারণের জন্যে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডার। একটি সিডি রমের ৬৫০ মেগাবাইট (৬৫ কোটি অক্ষরের সমান) তথ্য ধারণ ক্ষমতা রয়েছে।

কমপ্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি'র স্থায়িত্ব প্রায় একশো বছর। এই ডিস্কের সাহায্যে অক্ষর, সুর, সচল আলেখ্য, অ্যানিমেশন সব একসঙ্গে উপভোগ করা যায়। যে কোন মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটারে সিডি রম দেখা যায়, শোনা যায় এবং প্রিন্ট নেয়া যায়।

সম্প্রতি 'হাইটেক প্রফেশনাল' নামে একটি সংস্থা 'বাংলাদেশ ৭১' শীর্ষক একটি সিডি রম প্রকাশ করেছে। এতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক দুই হাজার পৃষ্ঠার তথ্য, সাড়ে তিন ঘন্টার অডিও, আধ ঘন্টার ভিডিও, দু'শ আলোকচিত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আমরা ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে সিডি রমের কথাও ভাবতে পারি।

ভিস্যুয়াল আর্কাইভ্স

বাংলাদেশে এখনো পরিকল্পিতভাবে ভিস্যুয়াল আর্কাইভ্স প্রতিষ্ঠিত হয় নি। 'ফিল্ম আর্কাইভ্স' নামে সরকারি যে প্রতিষ্ঠানটি রয়েছে তা প্রায় না থাকার মতোই। ভিস্যুয়াল মাধ্যমে ইতিহাসভিত্তিক কাজ করার জন্যে একটি সমৃদ্ধ আর্কাইভ্সের খুব প্রয়োজন।

আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইতিহাস চেতনার এতোই অভাব যে, সরকারের 'চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা বিভাগ' ও বাংলাদেশ টেলিভিশনে বিগত সরকারগুলোর কর্মতৎপরতার ফুটেজ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় নি। যে সামান্য সংরক্ষণ করা হয়েছে তা প্রধানত ব্যক্তি উদ্যোগে এবং অনেকটা গোপনে। ব্যক্তি উদ্যোগে অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার ফুটেজ সংরক্ষণ করা হয়েছে।

আমাদের দেশের বড় বড় ঘটনাগুলোর ভিস্যুয়াল সংগ্রহ করতে হলে আমরা বিবিসি আর্কাইভ্সের দ্বারস্থ হই। এতে অবশ্য আমরা লজ্জিত হই না।

সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে ফিল্ম আর্কাইভ্সের দায়িত্ব সম্প্রসারণ করে ফিল্ম ও ভিস্যুয়াল ম্যাটেরিয়ালের আর্কাইভ্স হিসেবে একে গড়ে তোলার জন্যে প্রস্তাব করছি।

শিক্ষা ও দেশপ্রেম

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে : ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতনতা ও সংরক্ষণের তাগিদ। আমাদের সকলের মধ্যে সেই তাগিদ থাকতে হবে। যদি তাগিদ থাকে কেবল তাহলেই নানারকম আয়োজনের কথা ভাবা যেতে পারে। তাগিদ সৃষ্টি হয় শিক্ষা থেকে। দেশপ্রেম থেকে। আমার আশঙ্কা হয়, আমরা বর্তমানে এমন এক সমাজে বসবাস করছি যেখানে প্রকৃত শিক্ষা ও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমের ঘাটতি রয়েছে। সেই ঘাটতি পূরণ করবে কে?

০৯ ডিসেম্বর ১৯৯৮

Hitherto Unknown Harikela Coins – Some Analytical Comments

Vasant Chowdhury

From the time that the so-called recumbent bull-type Yarikriya/Harikota coins were read as Harikela a new chapter was opened as far as the numismatic history of lower Bengal is concerned. After much controversy, it is now accepted that the original Harikela territory was initially located in the coastal regions of Chittagong district, to the north and south of the Karnafuli river. At different periods of history this territory expanded to include other adjoining areas of Bengal. A large number of these Harikela silver coins (two sides struck) have been found in different parts of Eastern Bengal (now Bangladesh), Myanmar and Tripura state in India. A substantial number of these coins were also unearthed during the Mainamati excavation (in Bangaldesh). From the palaeographic point of view, scholars have earmarked these coins as dating from the late 7th to 10th/11th century.

It is worth noticing here that the early type of Harikela coins are of 7.6 gms weight (Fig.-1). The theoretical weight of the full unit may have been 8 gms. It is stated that over the years these coins were struck with gradual developed palaeography and the weight standard systematically retrograded to a point of five grams only. But after examining a fair number of Harikela coins, one may arrive at an observation that this cannot be accepted as a rule. Harikela coins were in operation spanning a period of about four hundred years and its issuers were different at different periods of time. It is assumed that the Devas and the Chandras also were among the issuers of these coins. The theory that 'with grad-

ual developed palaeography... the weight standard systematically retrograded' it seems it could have been applicable to one particular set of issuer. When the next issuer of this coin took over he had probably started with a higher weight standard and the same process was repeated. This could be proved further only after scrutinising a large number of Harikela coins. Up to now, Harikela coins of three denominations have been found - full, half and quarter size. Recently a large number of lower denomination Harikela coins have appeared at the disposal of the Calcutta coin dealers. There are quite a few one-eight denomination coins with the Harikela inscription, which had not been found earlier. The one-eight denomination seated-bull type coins with the usual tripartite motif on the reverse, that had been known so far, were uninscribed and had been assigned by scholars to the Chandra dynasty coins of Arakan. Such coins are present in this hoard. The one-sixteenth denomination coins are similar to the one-eight denomination uninscribed coins, in that both coins have half-moon with dot motif above the seated-bull. The one-sixteenth denomination coins differ from the uninscribed one-eight denomination coins, in that the former were struck only on one side, leaving the reverse blank, possibly due to the tiny size of the coins. Although the uninscribed one-eignth denomination coins known so far had been ascribed to Arakan as stated earlier, we subscribe to the view that both the uninscribed one-eight denomination coins and the single-side struck uninscribed one-sixteenth denomination coins are from Harikela territory. The reasons for this conjecture are given below.

Coins of Arakani Chandra rulers are of three denominations - full, half and quarter, which are all inscribed. The abovementioned uninscribed one-eight denomination coin was erroneously assigned by the scholars to the Arakani dynasty (series) purely on conjectural basis. But it seems that both the uninscribed one-eights and the one-sixteenth denomination coins form a continous series with the full, half and quarter size Harikela coins. This viewpoint gains strength when we consider the fact that, as reported, there was not a single Arakani coin in this particular lot. Moreover, the tails of the bulls on some one-eight denomination (uninscribed) coins shows an upward twist at the end. This is in conformity with the bulls on the Harikela coins. This fact, we feel, allows us to make a strong case for the uninscribed one-eight denomination seated-bull type coin and the hitherto unknown identical looking one-sixteenth denomination seated-bull type coins as belonging to a continuous series - ranging from the full to the one-sixteenth size - from the Harikela territory. It could also be stated that the one-eighth issue was introduced with the inscription but to avoid further laborious workmanship on such a small dice, a more simpler, a little larger and thinner specimen was introduced as the replacement for the inscribed type. From the evidence of another inscribed one-eighth coin with a different reverse design it is confirmed that the process of change had taken place at two stages. First, the usual reverse design (tripartite with sun and moon) was changed to tripartite with crescent and dot at the top and at the next stage, the obverse inscription was replaced by the crescent and dot. The presence of this changed reverse design of the inscribed coin (tripartite with crescent and dot at the top) on the reverse of the uninscribed one-eighth issue helps us to ignore all the speculative attribution about the latter's origin and to put it as a part of the Harikela series.

It has also been observed that the different denominations of all the smaller issues are not always designed identically. Some quarter issues are inscribed with first two letters only (instead of four) i.e. Hari (fig.-6), the way it was practised in the Arakani Chandra quarter coinage.

The inscribed one-eighth has two types of reverse, the uninscribed one-eighth and the one-sixteenth have the seated-bull facing to the right or to the left. Palaeographic and the metrology study would lead us to ascribe, these smaller denomination issues (one-fourth, inscribed/uninscribed one-eighth and one-sixteenth) to an earlier period of the Harikela series. This could be ascertained by simple multiplication, if the sample weight of these coins - one-sixteenth (0.45 gms), the inscribed and uninscribed one-eighth (0.948 gms, 0.941 gms) and the one-fourth (1.86 gms) coins are converted in terms of their full unit, the weight would come to 7.3 gms, 7.5 gms, 7.5 gms and 7.6 gms respectively. This indicates that when these lower denominations were struck, the weight of the full unit of the Harikela coin was 7.6 gms or around. This weight also indicates the early stage of the coinage. It may also be presumed that the smaller types did not continue for long due to a probable reduction of the weight of the full unit. This justifies their extreme rarity and their non-existence in the Mainamati excavation.

The Harikela coins are now dated to around the second half of the 7th century. The question naturally arises : who started striking these Harikela coins? Widely varying views are offered by experts : Gutman says that the Khadga dynasty of Mainamati struck these coins; Cribb ascribes them to the 8th century Harikela king Kantideva of Chittagong; Mukherjee just mentions about 'Chittagong' without further elaboration; and interestingly enough Wicks has suggested that these were issued by Harikela ruler who might have migrated from Arakan. The fabric, patterns and metrology of these coins closely follow those of the early coins of the neighbouring country of Arakan, struck during the Chandra rulers.

It transpires from the Arakan history that after the Chandra rule (at the very beginning of the 7th Century) there was a disturbed period for about five decades. It is ascertained from the Anandachandra pillar inscription (at the Shitethaung monastery) that four rulers ruled during that era, they were Mohavira, Vrajayap, Sevinren and Dharma Sura respectively. According to Johnston they were possibly outsiders and their period of reign inscribed in this pillar are also doubted by Johnston. The next name mentioned in the inscription is Vajra Sakti (grandfather of Ananda Chandra) who also possibly belonged to a royal lineage since he is stated to be a member of the Deva dynasty. Among these five rulers, apart from that mentioned above, no other inscriptional evidence or presence of coins have been observed.

There is a coin of Surya Chandra and another inscribed stone pillar said to have been erected by ruler Surya Chandra who does not figure in the list of rulers in the Ananda Chandra pillar inscription, but whose rule may be placed on palaeographic evidence during the middle of the seventh century i.e. at the time of the disturbed period in Arakan history. It seems fair to presume this Surya Chandra to be belonging to the old Chandra dynasty and he had been trying to revive the Chandra rule in Arakan probably around the same time of Vajrasakti.

It is evident from the presence of these references bearing Surya Chandra's name that he must have succeeded in ruling for at least a brief period of time, but the omission of Surya Chandra's name from the list made by Ananda Chandra in the pillar is striking. The reason may be due to Ananda Chandra's desire to establish a clean, unbroken dynastic succession where Surya Chanadra's name would be unacceptable. Vajrasakti was succeeded by Dharmavijaya who was a strong and able ruler and reigned for thirty six years.

We know nothing of Surya Chandra or his descendants. If there had been any, he would have probably lived in the last years of Vajrasakti and the early years of Dharmavijay's rule. It is interesting to note here that in the northern face of the Anandachandra inscription, there are names of rulers belonging to a dynasty much later to Anandachandra's rule. Though the condition of the inscription is rather poor, the names of two rulers have been deciphered. They are Sri Singhagondapatisurachandra and his successor Sri Singhavikramasurachandra. Palaeographically this part of the inscription is dated to 10th/11th century A.D. From these 'suracandra' endnames one might infer that they were possibly establishing some sort of relationship with the king Suryachandra. But what had happend to Suryachandra? Since no other information about Suryachandra is available, the present author is making an attempt to construct a hypothetical historical sequence on the basis of some scanty evidences, which are as follows :

Suryachandra, after his brief rule in Arakan, around the middle of the seventh century was defeated and/or driven out, and went across the Naaf river to Chittagong which was then called Harikela. It is not unfair to presume that the exiled ruler Suryachandra was duly accompanied by his wise ministers and brave soldiers and also with personnel from the administration and treasury. He might have tried to get reinforcements there but the strong rule of Dharmavijaya prevented his return to Arakan. And only after his death his men might have settled down in Harikela territoty. The Arakani settlers in Harikela after the demise of their chief had to look for some new livelihood and to protect their interest might have formed an association or a guild of their own.

A vacuum in metal currency thus emanated in this region due to the discontinuation of Chandra coinage and hence, naturally a great demand for such coins at that time arose and the said guild realised this shortfall and need for coins for trading and other allied commercial purposes.

During the post-Gupta period, the rulers in Vanga and Samatata used to strike coins only in gold. No regular silver coinage was issued by them. In the Harikela area, no evidence of coinage exists for this period. Seeing this, among and guild members who were already familiar with the technique of striking coins and acquainted with the supply source of silver possibly had suggested to the ruler of the then Harikela that they might be allowed to issue coins - not of gold, but in silver, mainly for commercial advantages. Since these coins were not in gold, the ruler of Harikela might have not exercised his prerogative to inscribe his name on them and the guild may have been then instructed to inscribe the name of the kingdom (that is Harikela) on the coin. The fabric and the weight of coin, as expected, had followed the coin of Suryachandra where the tail of the bull has final upward twist which became the hallmark of the Harikela coinage.

Discovering the wide distribution of the Harikela coins, from Sylhet to Sandoway, it is evident that they found wide acceptance as trading currency and a very high purity of silver was the reason of such success.

A large hoard of Harikela coins were found in the Mainamati excavation. The level at which these were found ascribes them to the 8th century A.D., during the period of Deva rule in Mainamati. Some scholars opine that at the time of Chandras of Bengal these Harikela coins were produced. In this context we would like to suggest that, when these coins had started appearing in the Deva kingdom, in a consequence of trade, seeing the success of these trade-issues-Herikela coins - the

Devas started issuing identical coins bearing the name of their territory/city (i.e.) Pattiikera. These Pattikera coins have also surfaced at the same level as the Harikela coins found at Mainamati. However, the fact that Pattikera coins - to the present state of our knowledge, have not been found elsewhere, only indicates that these coins did not find much acceptance as trade currency, unlike the Harikela coins.

We have conjectured that the silver Harikela coins were introduced by the said guild. Of interest, is the recently deciphered metal vase of the Harikela ruler Devatideva Bhattarka now deposited at the National Museum of Bangladesh. It is this case that gives the names of land donors to Buddhist monasteries in the Harikela kingdom, and is dated in the Arakani era, which when converted, comes to 715 A.D. at the time of Devatideva's rule. It is noteworthy that his particular date is not too long after the introduction of the Harikela Coin. Among the donors the names of two particular individuals - Kulachandra and Ratnachandra, are interesting. This is also significant due to the fact that they testify to the persence of Buddhist Chandras in Harikela territory; also, by profession, they were goldsmiths, so, quite assumptively, they may have had some relation to striking coins. Again, the presence of the Arakani era on the inscribed vase of Harikela, (instead of any other method of dating, practised then at Vanga and Samatata) only establishes how prevalent the Arakani cultural penetration was in the Harikela territory, at the point of time. These examples are cited as indirect support for the proposition regarding Suryachandra and the guild that was formed by his men.

Apart from the Harikela/ Pattikera coins also other recumbent bull-type varities of (two-sides struck) coins are noticed with the legend Okario, and a series with Akara end-names. Of this Akara series, four coins of Lalitakara, Ramyakara, Pradyumnakara and Attakara or Antakara were first noticed by R.D. Banerjee in 1920, who assigned them to 10th Century A.D. From time to time, some of these Akara coins have surfaced in the Mainamati excavation. R.D. Banerjee had ascribed these silver coins to Arakan, but later scholars have ascribed them after the Devas of Mainamati. Recently, a small hoard of Akara coins has surfaced in Bangladesh with some new names of rulers. John Deyell formerly from Dhaka has sent the present author the photographs of those coins which are illustrated in this article.

These are read as follows:

1. Attakara (not Antakara as also alternatively suggested by Banerjee)
2. Aryakara
3. (Dha)rmakara
4. Kalyanakara
5. (Ra)myakara - noticed by Banerjee but the suggested reading is (A) ppakara.
6. Pradyumnakara - noticed by Banerjee
7. -------nadakara?

These are all full issues but no further details are available at present.

On the evidence of another deciphered metal-vase (Sotheby's sale catalogue 12th October, 1989, Lot 38) (Fig. 19) which states about the land-grants to the Buddhist monasteries by the chieftain of the Rajadhiraj Attakaradeva, who was the ruler of Harikela, also mentioning that his capital was at Vardhamanpura. Paleographically this vase is dated around 10th century A. D. As no genealogical evidence is available on the vase we are unable to place the Akara dynasty in its proper chronological order. However, it is apparent now that the Akara kings were the rulers of Harikela during the 10th century and after, when the Chandras of Bengal were ruling Vanga. The view that the Akaras were the rulers of Arakan or Mainamati held by earlier scholars may be revised now.

০৯ নভেম্বর ১৯৯৮

Hitherto Unknown Harikela Coins - Some Analytical Comments

প্রবন্ধের উপর আলোচনা

শামসুল হোসাইন

চট্টগ্রামের প্রাচীন ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার কাজ এগোয় নি। বেশ কিছু মুদ্রা, কয়েকটি তাম্রশাসন ও পাত্রলেখ, একগুচ্ছ ভাস্কর্য, আরব ভৌগোলিকদের বিবরণ ইত্যাদি উপাদান চট্টগ্রামের একটি উজ্জ্বল অতীতের ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু এসব কিছুকে ঘষে-মেজে একটি চেহারা বের করার দেশীয় উদ্যোগ অপ্রতুল। চট্টগ্রামের ইতিহাস-চর্চায় নিয়োজিত অগ্রণী গবেষকগণের কেউ কেউ তাঁদের রচনায় আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থানীয় ইতিহাস গবেষণার একটি স্কুল সৃষ্টি করা যাবে। কিন্তু বাস্তবে কিছু ব্যক্তি-কেন্দ্রিক কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হলেও, সামূহিক কোন কেন্দ্র গড়ে ওঠে নি এবং পরিকল্পিত ইতিহাস রচনার কাজও এগোয় নি। এতে ইতিহাসের কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন জায়গা আলোকিত হয়েছে মাত্র।

কোলকাতার বেশ কয়েকজন ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক চট্টগ্রাম বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রাচীন চট্টগ্রামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে ফলপ্রসূ গবেষণা শেষে কেবল আন্যোয়ারা উপজেলার ঝিয়রি গ্রামে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ভাস্কর্য নিয়েই কোলকাতা ও দিল্লি থেকে দুটি গবেষণামূলক বই প্রকাশিত হয়েছে। ড. বি. এন. মুখার্জি, ড. দেবলা মিত্র, অশোক ভট্টাচার্য ও বসন্ত চৌধুরী প্রাচীন চট্টগ্রামের ইতিহাসের উপাদান নিয়ে গবেষণা করছেন। এঁরা সকলেই স্বনামধন্য পণ্ডিত ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ।

বসন্ত চৌধুরী মূলত বাঙলার মধ্যযুগের মুদ্রা নিয়ে গবেষণা করেন। কিন্তু সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, তিনি হরিকেলের মুদ্রায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। কর্ণফুলির তীরে গড়ে ওঠা হরিকেল রাজ্য এক সময় এতই প্রভাবশালী হয়ে পড়ে যে, সন্নিহিত বঙ্গোপসাগর এই রাজ্যের নামে পরিচিত হয় – আরবরা বলতো : হরকন্দের সমুদ্র। পঠিত প্রবন্ধে বসন্ত চৌধুরী অনুমান করতে চেষ্টা করেছেন কারা এই রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করার চেষ্টা করেছিল এবং কেন এই মুদ্রায় রাজার বদলে রাজ্যের নাম খোদাই করা হয়েছে। মুদ্রা-সাক্ষ্যে প্রতীয়মান হয় যে, হরিকেলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বাজার দর পণ্যভেদে সুনির্দিষ্ট ও স্থিতিশীল। টাকা, আধুলি, সিকি, অর্ধসিকি ও আনা মানের মুদ্রার প্রচলন দেখে একটি আর্থিক শৃঙ্খলার কথাই ভাবনায় আসে – যা সে যুগেই হরিকেল রাজ্য অর্জন করতে পেরেছিল।

বসন্ত চৌধুরীর গবেষণায় হরিকেলে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলনের উদ্যোক্তা হিসেবে অভিবাসী আরাকানি চন্দ্রবংশীয় রাজা সূর্যচন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি গিল্ডকে সনাক্ত করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। গুপ্ত-পরবর্তীকালে বঙ্গ-সমতট-হরিকেল রাজ্যসমূহে রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন ছিল না। কিন্তু বাজার অর্থনীতির অনুষঙ্গ হিসেবে সাধারণো ছিল এর যথেষ্ট চাহিদা। এই চাহিদার সুযোগে সমুদ্র-বন্দর সমৃদ্ধ হরিকেল রাজ্যেই প্রথম রৌপ্য মুদ্রা জারি হয় এবং উন্নত মানের জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোতেও যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে গবেষক দুটি নতুন আবিষ্কারও উপস্থাপন করেন : ১. লিপিযুক্ত অর্ধসিকি এবং ২. এক আনা মানের হরিকেল মুদ্রা।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত হরিকেল রাজ দেবাতিদেব ভট্টারকের পাত্রলিপি সূত্রে এই রাজ্যের বৌদ্ধ বিহারগুলোর কল্যাণে ভূমিদাতাগণের নাম জানা যায়। লিপিতে আরাকানে অনুসৃত পদ্ধতিতে দেওয়া সন খ্রিষ্টাব্দে পরিবর্তন করলে সময় দাঁড়ায় ৭১৫। বসন্ত চৌধুরীর অনুমান, এই কাল হরিকেল মুদ্রা প্রচলনের সমসাময়িক। ভূমিদাতা কূলচন্দ্র ও রত্নচন্দ্রের পেশাগত সেকরা পরিচিতি এবং চন্দ্র পদবীধারী বৌদ্ধদের হরিকেলে উপস্থিতি ইত্যাদি উপাত্ত থেকে তিনি অনুমান করেন যে, মুদ্রা প্রচলনে এদের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে। এছাড়াও পাত্রলেখে আরাকানি সনের উল্লেখ বিবেচনায় হরিকেলের সংস্কৃতিতে আরাকানের সমূহ প্রভাবের বিষয়টিও বসন্ত চৌধুরীর নজর এড়ায় নি।

জন ডিয়েল কর্তৃক সরবরাহকৃত মুদ্রা-চিত্র থেকে আকর প্রাপ্তনাম যুক্ত কয়েকজন নতুন শাসকের মুদ্রা এবং আনুমানিক দশম শতাব্দীতে জারিকৃত হরিকেল রাজ অট্টাকর দেবের একটি পাত্রলেখ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা দিয়ে শ্রোতাদের অতৃপ্ত রেখেই যেন সমাপ্ত হয়েছে এই সমৃদ্ধ প্রবন্ধটি। কিন্তু যাঁরা সুদূরাঞ্চল চট্টগ্রামের ইতিহাস নিয়ে দেশে-বিদেশে নিরলস চর্চা করছেন তাঁদের প্রতি জাগিয়েছে কৃতজ্ঞতাবোধ।

হরিকেল মুদ্রা

হরিকেল রাজ দেবাভিদেব ভট্টারকের রাজত্বকালে লিপিসজ্জিত ধাতব আধার
একই রকম আরেকটি আধারের ছবি প্রচ্ছদে ব্যবহৃত হয়েছে

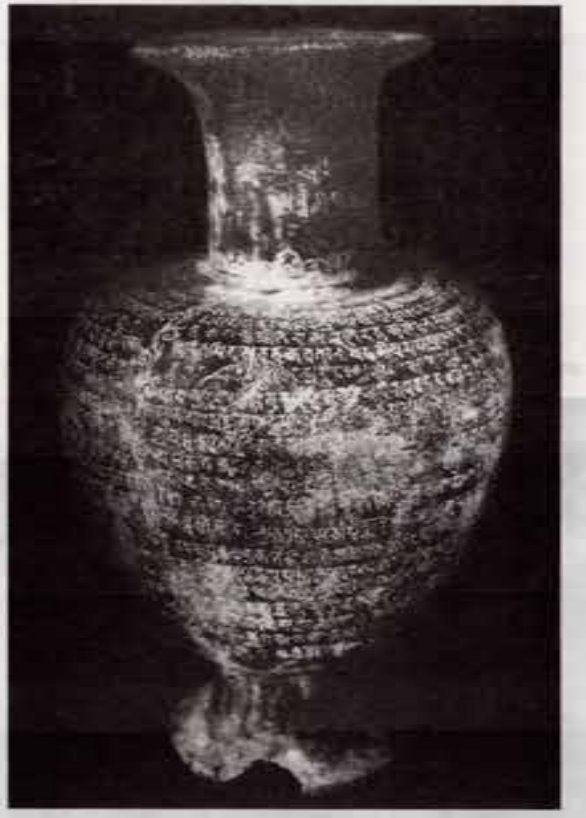

রজত জয়ন্তী উপলক্ষে জাদুঘর পার্কের স্মৃতিবৃক্ষ চত্বরে
একটি জাগর গাছের চারা রোপন করছেন উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নান

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধের নিদর্শন বিষয়ক বিশেষ প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

চট্টগ্রাম কলাভবন
২৬ মার্চ ১৯৭৪

উপাচার্যের ভাষণ

আবুল ফজল

চট্টগ্রামের ইতিহাস বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ। স্মরণাতীত কাল থেকে একটি বিশিষ্ট সামুদ্রিক বন্দর হিসেবেও চট্টগ্রাম সমধিক পরিচিত। মুসলমানদের মধ্যে আরব বণিকেরা সর্বপ্রথম চট্টগ্রামের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রাচীন আমলে মোটামুটি বর্তমানের চট্টগ্রাম বিভাগ এলাকাটি সমতট নামে পরিচিত ছিল এবং অনেক সমৃদ্ধশালী রাজবংশ এ এলাকায় নিজেদের রাজত্ব স্থাপন করেছিলো। সুলতানি এবং মোগল আমলেও এ এলাকার অধিকার নিয়ে বাংলার সুলতান, ত্রিপুরার রাজা, মোগল সুবাহ্‌দার এবং আরাকানের মগ রাজারা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। অবস্থান-বৈশিষ্ট্যের জন্যেও এ এলাকার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ভাষা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের পাশাপাশি একটি পৃথক সত্তা নিয়ে গড়ে উঠে। মুসলমান সুলতানদের মধ্যে ফখর-উদ-দিন মুবারক শাহ্ সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম অধিকার করেন। চট্টগ্রাম অভিযান কালে কদল খান গাজী তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। সাধারণ লোক তাঁকে শাহ্ কাতাল নামে অভিহিত করে থাকেন। শহরের উত্তর পার্শ্বে কাতালগঞ্জে তাঁর সমাধি।

রাজা, সুলতান, সুবাহ্‌দার বা অন্য কোন রাজ প্রতিনিধি চট্টগ্রাম বিভাগ এলাকায় শাসনকালে অনেক জনহিতকর কাজ করেছিলেন - এতে কোন সন্দেহ নেই। মসজিদ-মন্দির নির্মাণ, দিঘি-পুকুর খনন, রাস্তা-পুল তৈয়ার এর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ঐতিহাসিক এবং পুরাতাত্ত্বিকগণের সজাগ অনুসন্ধান এবং জরিপের অভাবে এ এলাকার অনেক পুরাকীর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা ধ্বংসের পথে। আলেকজান্ডার কানিংহাম, ড. আহমদ হাসান দানী প্রমুখ প্রখ্যাত পুরাতাত্ত্বিকগণও কখনও এ এলাকায় জরিপ কাজ চালান নি। বাংলাদেশে তাঁদের সর্বশেষ গন্তব্যস্থল ছিলো সোনার গাঁ। এর পূর্ব দিকে তাঁরা কখনও অগ্রসর হন নি। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এখনও অনেক পুরাতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ পর্যবেক্ষণ এবং সংরক্ষণের অভাবে ধীরে ধীরে কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এমনকি কোন কোন স্থানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শনও পাওয়া যেতে পারে। ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড পাহাড়ে অশ্মীভূত কাঠের একখানা কৃপাণ আবিষ্কৃত হয়েছিল বলে স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। শুনে আপনারা আশ্চর্য হবেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়

উপাচার্যের বাসভবন নির্মাণের জন্য একটি সুউচ্চ পাহাড়ের শিখরে ভিত কাটার সময় মাটির বেশ গভীরে দু'খানি ধাতু নির্মিত থালা আবিষ্কৃত হয়। থালা দু'খানির নির্মাণ-কৌশল প্রাচীন এবং এগুলো বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর এ এলাকার ঐতিহাসিক সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করে ইতিহাস বিভাগের প্রধান এবং বাংলার ইতিহাসে একজন বিশেষজ্ঞ প্রফেসর আবদুল করিমের নেতৃত্বে বিভাগের প্রথম ব্যাচের কয়েকজন ছাত্র কিছু নমুনা জরিপ করেছিলেন এবং অত্যন্ত সুখের বিষয় তাঁদের সে জরিপ অত্যন্ত সফল হয়েছিলো। তাঁরা সুলতানি আমলের দু'টি মসজিদ আবিষ্কার করেছিলেন এবং এগুলো সম্পর্কে ড. করিম এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও মিরশ্বরাইস্থ পরাগলপুর গ্রামের ছুটি খানের দিঘির পাড়ে অবস্থিত ছুটি খানের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে আরবি ভাষায় খোদিত দুখানি শিলালিপিসহ অনেক পুরাকীর্তি সংগ্রহ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার প্রাক্কালেই পুরাতাত্ত্বিক বস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার তাগিদ অনুভূত হয়। অধুনালুপ্ত ন্যাশনাল ব্যাংক (বর্তমানে সোনালী ব্যাংক) দোহাজারীস্থ হাজারী পরিবার থেকে অনেক ঐতিহাসিক বস্তু সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী দিবসের আগেই বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন। এর মধ্যে লিপি খোদিত তিনটি কামান, কিছু প্রাচীন তরবারি, পোশাক-পরিচ্ছদ অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী দিবসেই এগুলোর একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চট্টগ্রামের অবদান অবিস্মরণীয়। প্রাচীন পুঁথি-পুস্তক এ এলাকা থেকে যে পরিমাণে সংগৃহীত হয়েছে এমন বাংলাদেশে আর কোথাও হয় নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এ সব প্রাচীন দলিলপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণে চট্টগ্রামে কোন প্রতিষ্ঠান এতদিন গড়ে উঠে নি। এ বিষয়ে মরহুম আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের একক প্রচেষ্টার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

অতীতের কথা বাদ দিলেও আমাদের স্মরণের মধ্যেই এমন সব ঘটনা ঘটে গেলো যার স্মৃতি সংরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। চট্টগ্রাম দু'দুটি স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলো। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চট্টগ্রামের যুবকগণ অকুতভয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলো। আর পাকিস্তানি সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ছিলো প্রথম কাতারে। শুধু দর্শনীয় বস্তু হিসেবে নয় একটি জাতির সংগ্রামী ইতিহাসের উপাদান হিসেবেই এ সব সংগ্রামের দলিলপত্র সংরক্ষিত হওয়া উচিত। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত জাদুঘর হিসেবে চট্টগ্রাম জাদুঘরের প্রধান কর্তব্য ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদিতে গবেষণার প্রাথমিক দলিলপত্র সংগ্রহ করা। গবেষণা জাদুঘর হিসেবেই এটাকে গড়ে তুলতে হবে।

এখনও আমাদের দেশের ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতির উপর গবেষণামূলক কাজ করার জন্য বিদেশে দৌড়াতে হয়। এ সম্পর্কিত উপাদান ও দলিলপত্র বিদেশেই পাওয়া যায়। এটা খুব সুখের কথা নয়। আমাদের ঐতিহ্যের সংরক্ষণে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

এসব কথা চিন্তা করেই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনাকারীগণ এ এলাকায় একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্থাপিত হবার সাথে সাথেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় এর আগেই স্থাপিত জাদুঘরগুলোর কর্তৃত্বভার তুলে নেয়। এটি খুব উচিত কাজ হয়েছিলো। কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষাপর্যায়ে গবেষণাধর্মী কাজের সহায়তায় জাদুঘরের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু এমন কোন উত্তরাধিকার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাগ্যে জোটে নি।

বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের জন্য এখনও আমরা কোন স্থায়ী ভবন নির্মাণ এমন কি কোন অস্থায়ী প্রদর্শনী কক্ষেরও ব্যবস্থা করতে পারি নি; আজ আমরা অত্যন্ত আনন্দিত একারণে বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর এখনো তার শৈশব কাটিয়ে উঠতে না পারলেও আজকের এ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পেরেছে। এটি আমাদের প্রথম প্রদর্শনী আর এর প্রদর্শনীয় বস্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র। আমি এর সার্বিক সফলতা কামনা করি। বিগত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আমাদের সত্তার গভীরে আজো শিহরণ জাগায়। অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার পর আমরা আজ স্বাধীন; এ প্রদর্শনী আমাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার ও বাঁচার সংগ্রামের এক অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর হয়ে থাকলো।

২৬ মার্চ ১৯৭৪

স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

জাদুঘর অঙ্গন
১০ আগস্ট ১৯৯২

স্বাগত ভাষণ

শামসুল হোসাইন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি প্রফেসর রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, প্রদর্শনীর উদ্বোধক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল হক, মঞ্চে উপবিষ্ট আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সুপারনিউমেরারি প্রফসর ড. আবদুল করিম, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের নতুন ও স্থায়ী ভবনের আঙিনায় এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানানোর সুযোগ পেয়ে আমি গৌরব বোধ করছি। ১৯৭৩ সালের ১৪ জুন একখানা নিয়োগপত্র হাতে নিয়ে যখন আমি এই জাদুঘরের সহকারী কিউরেটর পদে যোগদান করি তখন কল্পনাও করতে পারি নি যে, এমন একটি সুন্দর ভবন আমার চাকরিকালের মেয়াদের মধ্যেই জাদুঘরের জন্যে পাওয়া যাবে। কারণ তখন এর জন্যে কোন একটি নির্দিষ্ট কক্ষ, মায় একখানা চেয়ার বা একটি টেবিলও ছিল না। সুতরাং আমার বক্তব্যের শুরুতেই আমি প্রত্নপ্রেমী সুধীজনদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা এই ভবনের নির্মাণ কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

শুরুতে এই জাদুঘরের জন্যে যে কক্ষটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের দোতলায় বরাদ্দ করা হয়েছিল, এখন সে কক্ষে ইংরেজি বিভাগের সভাপতি সাহেব বসেন। সেখান থেকে পরে ঐ ভবনের নিচ তলার দু'টি কক্ষে, তারপর শহরের মৌলানা মোহাম্মদ আলী সড়কের চট্টগ্রাম কলা ভবনে, আবার ক্যাম্পাসে ফিরে এসে পুরাতন গ্রন্থাগার ভবনের (বর্তমান প্রশাসনিক অফিস) চার তলায়, সবশেষে এই স্থায়ী ভবন। উনিশ বছরের আয়ুষ্কালে পাঁচ বার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে এ জাদুঘরকে।

ইতিহাস বিভাগের তিরিশটি পুরাকীর্তি নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর যাত্রা শুরু করে। এ সংগ্রহে ছিল নয়টি বস্ত্রসম্ভার, চৌদ্দটি যুদ্ধাস্ত্র, দু'খণ্ড শিলালিপি, দু'টি ভাস্কর্য, এক খণ্ড স্থাপত্যাংশ এবং দু'টি পিতলের থালা। তৎকালীন পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রত্নপ্রেমী মমতাজ হাসানের আনুকূল্যে উপরোক্ত সংগ্রহের সিংহভাগ ইতিহাস বিভাগ অনুদান হিসেবে পায়।

সর্বজনাব নুরুল কাদের খান ও মহিউদ্দীন হোসাইনের সৌজন্যে সংগৃহীত হয় ভাস্কর্য দু'টি। অবশিষ্ট পুরাকীর্তিগুলো ওই বিভাগের তৎকালীন শিক্ষক ও ছাত্রদের যৌথ প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপের ফসল হিসেবে ঘরে ওঠে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য, ইতিহাসবিদ এবং বরেন্দ্র জাদুঘরের এককালীন অবৈতনিক কিউরেটর প্রফেসর আজিজুর রহমান মল্লিক এবং ইতিহাস বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল করিম বিভাগের এই পুরাকীর্তি সংগ্রহটি গড়ে তোলার কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রফেসর করিম তখন বিভাগের কয়েকজন ছাত্রকে সাথে নিয়ে মাঝে মাঝে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে বের হতেন। ইতিহাস বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে এই অনুসন্ধান জরিপে অংশগ্রহণের এক দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলাম আমরা। এখন বোধ হয় সেই রেওয়াজ আর প্রচলিত নেই। চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসক জনাব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ খান প্রশাসনিক সাহায্য না করলে মিরেশ্বরাইর ছুটি ঘাঁর মসজিদের ধ্বংসাবশেষ থেকে দু'খণ্ড শিলালিপি ও মেহরাবের খিলানটি সংগ্রহ করা তখন সম্ভব হতো না।

এখন এই জাদুঘরে সংগৃহীত পুরাকীর্তিগুলো প্রায় দু'হাজার বছরের ইতিহাস বক্ষে ধারণ করে আছে। এই সংগ্রহের সংখ্যা এক হাজার পাঁচ শ' ছিয়াশি। এ ছাড়াও প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, দলিলপত্র, দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও সাময়িকী, সহায়ক গ্রন্থাবলি মিলিয়ে আরও প্রায় আড়াই হাজার সংগ্রহ আছে জাদুঘর গ্রন্থাগারে। বগুড়ার মহাস্থান অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একখণ্ড প্রাচীন পোড়ামাটির ফলক ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া ছাপাঙ্কিত মুদ্রা দিয়ে শুরু করে কালপরম্পরায় এ সংগ্রহের শেষ প্রান্ত সীমায় আছে লোকশিল্প এবং আধুনিক শিল্পকলার নিদর্শন।

কিন্তু আমাদের সকল ধরনের সংগ্রহের একটি প্রতিনিধিত্বমূলক প্রদর্শনী উপস্থাপন করার সুযোগ আমরা পাই নি কখনো। স্থানাভাব এর প্রধান কারণ। এই নতুন জাদুঘর ভবনের মাত্র এক তলার কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় তলার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি। একতলার এই অংশেও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে দু'টি কক্ষ ও সেমিনার গ্যালারিটি অস্থায়ীভাবে ব্যবহারের জন্যে ছেড়ে দিতে হয়েছে। দোতলার কাজ শেষ হওয়ার পর জাদুঘরের পুরো অংশটি ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া গেলে এর কার্যক্রম আরও বহুবিস্তৃত করা সম্ভব হতে পারে। জাদুঘরে একটি আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক স্টোর ব্যবস্থা প্রবর্তন, প্রত্ন-সামগ্রী নিবন্ধন ও ফিল্ড ওয়ার্কের জন্যে ডকুমেন্টেশন সেন্টার স্থাপন, পুরাকীর্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কনজারভেশন ল্যাবোরেটরি প্রতিষ্ঠা, জাদুঘরের রেফারেন্স লাইব্রেরির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ও আর্কাইভ শাখা প্রবর্তন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলেই পুরাকীর্তি ও ঐতিহ্য বিষয়ক অন্যান্য গবেষণা-উপাদান সংগ্রহের যৌক্তিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে। উচ্চতর গবেষণার লক্ষ্য সামনে রেখে যদি এই সংগ্রহ গড়ে তুলতেই হয় তাহলে চিন্তা করতে হবে আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা। এই হচ্ছে একটি একাডেমিক মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠার মূল দাবি। এই সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে কেবল মাত্র পুরাকীর্তির বা প্রাচীন দস্তাবেজের একটি সংগ্রহ গড়ে তোলাই সম্ভব, একে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। এর পর আসে প্রশিক্ষিত ও নিষ্ঠাবান জনশক্তির সমস্যা। যাঁরা প্রজ্ঞা ও শ্রম দিয়ে জাদুঘরের সকল কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন।

আজ সত্যিকারভাবেই আমি আবেগ আক্রান্ত ও স্মৃতিভারাতুর হয়ে পড়েছি। বিশেষ করে মনে পড়ছে তাঁদের কথা, যাঁরা নানা ভাবে এই জাদুঘরকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। সুতরাং সমস্যার কথা না বাড়িয়ে ঐসকল প্রত্নপ্রেমী ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েই এই বক্তব্য শেষ করতে চাই।

প্রফেসর আবদুল করিমের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষণা না পেলে এ জাদুঘর আদৌ স্থাপিত হতো কিনা সন্দেহ। আর একজন ব্যক্তি ইতিহাসের কেউ না হয়েও পরোক্ষভাবে এ জাদুঘরকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনুস। জাদুঘরের নিয়মাবলি রচনা ও সংগ্রহ কাজে সহায়তা করেন প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন।

প্রফেসর আনিসুজ্জামান, প্রফেসর মোকাদ্দেসুর রহমান, প্রফেসর মঈন-উদ-দীন আহমদ খান, প্রফেসর আসমা সিরাজুদ্দীন, প্রফেসর এম.এ.গফুর, প্রফেসর মুর্তজা বশীর, প্রফেসর মুখলেসুর রহমান, ডক্টর নাজিমুদ্দীন আহমদ, প্রয়াত অধ্যাপক রশীদ চৌধুরী, ডক্টর হারুন-অর-রশীদ, ডক্টর আবদুস সাঈদ বিভিন্নভাবে সাহায্য করে এই জাদুঘরের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করেন।

জাদুঘরের বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিশেষ করে ফিল্ড ওয়ার্ক ও প্রদর্শনীর কাজে সহায়তা করেন প্রফেসর আবদুল মান্নান, ডক্টর রণজিৎ শর্মা, ডক্টর ভূঁইয়া ইকবাল, ডক্টর ইমরান হোসেন, জনাব মাসুদ মাহমুদ ও জনাব আবুল মনসুর।

জাদুঘরের উন্নয়ন সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে উৎসাহ যুগিয়েছেন প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম, প্রফেসর মাহবুব উল্লাহ, প্রফেসর মইনুল ইসলাম, জনাব হায়াত হোসেন।

এছাড়াও আমরা বিভিন্ন সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি। এ সময় আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে জাদুঘরের প্রয়াত অফিস সহকারী মরহুম আফসার আহমদ চৌধুরীর কথা, একজন নিষ্ঠাবান কর্মী হিসেবে যিনি এ জাদুঘরকে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন।

এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজনের কর্মব্যস্ত সময়ের ফাঁকে এই বক্তব্যের খসড়া তৈরি করতে গিয়ে তাড়াহুড়োর মধ্যে অনেকের নাম হয়ত উল্লেখ করা সম্ভব হয় নি, যাঁদের সহায়তা না পেলে এ জাদুঘরের উন্নয়ন ব্যাহত হতো। এই অপারগতার জন্যে আমরা ক্ষমা প্রার্থী।

আজ এই অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্যে যিনি আমাদের সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর ট্রাস্টের সভাপতি প্রফেসর রফিকুল ইসলাম চৌধুরী । উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ার পর প্রদত্ত ভাষণে তিনি গ্রন্থাগার ও জাদুঘরের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষণায় এই জাদুঘরের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে–এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং কষ্ট করে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে আবারো আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

ধন্যবাদ সবাইকে।

১০ আগস্ট ১৯৯২

সূচনা ভাষণ

আবদুল করিম

মাননীয় উপাচার্য, মাননীয় প্রধান অতিথি, জাদুঘর অধ্যক্ষ এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই জাদুঘরের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে কারণ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠালগ্নে সামান্য হলেও আমার কিছু অবদান ছিল। এই অনুষ্ঠানের সূচনা বক্তব্য রাখার জন্য আমাকে মনোনীত করায় আমি আপনাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর রফিকুল ইসলাম চৌধুরী আমার বিশিষ্ট বন্ধু, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা থেকে আমরা সহযোগী হিসাবে অনেকদিন কাজ করেছি। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি হবে, এই বিশ্বাস আমার আছে। ইতিমধ্যেই আমরা তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বের সুফল পাচ্ছি। মাননীয় প্রধান অতিথি প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল হক আমার শিক্ষক। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট করে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমাদের ধন্য করেছেন, তাঁর উপস্থিতিতে আমরা উৎসাহ বোধ করছি। তাঁকে আমার নিজের এবং আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

দিল্লির সুলতানেরা প্রায় শিকারে বের হতেন। সুলতান ফিরুজ শাহ তুগলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.) এইরূপ শিকারে গিয়ে দিল্লির প্রায় ১৫০ মাইল দূরে তোপরা নামক গ্রামে এবং মিরাটে দুটি পাথরের সুউচ্চ স্তম্ভ দেখতে পান। স্তম্ভগুলি এত উঁচু এবং মসৃণ ছিল যে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। তাঁর ইচ্ছে হল তিনি স্তম্ভগুলি দিল্লি নিয়ে যাবেন। তিনি আরও দেখেন যে স্তম্ভের গায়ে কিছু লিপি খোদিত আছে। সুলতান বা তাঁর সঙ্গীরা লেখা পড়তে পারলেন না। সুলতান বুঝতে পারলেন যে, এটি প্রাক্-মুসলিম যুগের লেখা, তাই হিন্দুরা পড়তে পারবেন। ব্রাহ্মণ-পন্ডিতদের ডাকা হল, কিন্তু তাঁরাও পড়তে পারলেন না। একজন সুচতুর ব্রাহ্মণ মিরাটের স্তম্ভলিপি দেখে বললেন, এতে লিখা আছে যে, ফিরুজ শাহ নামে একজন সুলতান দিল্লির সিংহাসনে বসবেন, তিনি স্তম্ভটি দিল্লি নিয়ে যাবেন। সুলতান খুশি হলেন, ব্রাহ্মণ পুরস্কৃত হল।

ফিরুজ শাহ স্তম্ভ দুইটি দিল্লি নিয়ে গেলেন। কিন্তু তখনকার দিনে এত বড় স্তম্ভ তোপরা বা মিরাট থেকে দিল্লি আনা অত সোজা ছিল না। তাই প্রকৌশলী নিয়োগ করা হল। তাদের পরামর্শে এবং তত্ত্বাবধানে অনেক কষ্টে এবং অনেক অর্থব্যয়ে স্তম্ভ দুইটি দিল্লি আনা হয়। তখন আর এক সমস্যা দেখা দিল, স্তম্ভ দু'টি রাখা হবে কোথায় এবং কীভাবে? আবারও প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে ফিরুজ শাহের রাজধানী ফিরুজাবাদে একটি প্রকাণ্ড ত্রিতল ভবন নির্মাণ করা হয়। এই ত্রিতল ভবনটি এমনভাবে নির্মাণ করা হয় যে, প্রথম তলা থেকে দ্বিতীয় তলাটি ছোট এবং দ্বিতীয় তলা থেকে তৃতীয় তলা আরও ছোট। মিরাটের স্তম্ভটি প্রথম তলায়, পরে দ্বিতীয় তলায় এবং শেষে তৃতীয় তলায় তুলে সেখানে স্থাপন করা হয়। এই স্তম্ভ স্থাপন করা ছাড়া এই বিরাট ভবনের আর কোন কার্যকারিতা নাই। স্তম্ভটি এখনও সেখানে অটুট আছে, এবং ভবনসহ স্তম্ভটি দিল্লির এক অপূর্ব দর্শনীয় বস্তু। দ্বিতীয় স্তম্ভটি ফিরুজাবাদ প্রাসাদে স্থাপন করা হয়, এটি পরে ভেঙ্গে তিন টুকরা হয়ে যায়। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এটি জোড়া লাগিয়ে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করেছে। স্তম্ভ দুইটি দিল্লি এনে পুনঃস্থাপন করার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ছবি সহ একটি সরস বিবরণ সীরত-ই-ফীরুজশাহী নামক ফারসি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

স্তম্ভ দুইটি আসলে মৌর্য অশোকের (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২), এবং স্তম্ভের লেখা আসলে অশোকের Edict বা অনুশাসন। ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত শিলালিপি তাই ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা পড়তে পারেন নি।

এই কাহিনী থেকে বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ-পন্ডিতেরা তাদের ঐতিহ্য ভুলে যায়, ব্রাহ্মী লিপি সম্পর্কে তদের কোন ধারণাই ছিল না। অনুরূপভাবে প্রাক্ মুসলিম আমলের অনেক ভবন, মন্দির, বৌদ্ধ বিহার, তাম্রলিপি ও শিলালিপিও লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। মুসলমান শাসকেরাও অনেক ভবন তৈরি করেন এবং আরবি ও ফারসি শিলালিপি উৎকীর্ণ করেন। মুসলমান শাসকদের মুদ্রায়ও আরবি ও ফারসি লিপি উৎকীর্ণ হত। মুসলিম আলেমরাও এইগুলির পঠন-পাঠনে অনভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এক কথায় বলতে গেলে প্রাক্-মুসলিম এবং মুসলিম আমলের ইতিহাসের উপকরণ এবং নিদর্শন সম্পর্কে আমাদের দেশের লোকেরা অজ্ঞ হয়ে যায় এবং ইতিহাস হয়ে যায় বিস্মৃত।

ইংরেজ আমলে আধুনিক ইতিহাস লেখা আরম্ভ হলে দেখা যায় যে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের ইতিহাসের উপকরণের বিশেষ অভাব রয়েছে। প্রাক্-মুসলিম আমলের কোন লিখিত ইতিহাস ছিল না, মুসলিম আমলে লিখিত ইতিহাস থাকলেও তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণার জন্য প্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ স্যার উইলিয়াম জোন্স ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতায় এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাস ও ঐতিহ্য গবেষণায় এই সোসাইটির অবদান অপরিসীম। আঠার শতকের শেষ দিক থেকেই ইংরেজরা ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থানে তথ্যানুসন্ধানে লেগে যায়। এই রূপ একজন ছিলেন ফ্রান্সিস বুকানন। তিনি উত্তর বঙ্গ এলাকায় অনুসন্ধান করে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেন। আরও অনেকেই সীমিত আকারে অনুসন্ধান করেন। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে, প্রচুর শিলালিপি, তাম্রলিপি, মন্দির, মসজিদ এবং বৌদ্ধ বিহার ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, যেগুলি দেশের ইতিহাসের গৌরবময় ভূমিকার স্বাক্ষর।

উপরোক্ত তথ্যানুসন্ধানের ফলে প্রমাণিত হল যে, দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ব্যাপক উদ্যোগের প্রয়োজন এবং এই উপলব্ধির ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয় ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব জরিপ বিভাগ (Archaeological Survey of India) এবং এই বিভাগের প্রথম পরিচালক ছিলেন বরেণ্য প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম। এই বিভাগের উদ্যোগে অসংখ্য শিলালিপি, তাম্রলিপি, মন্দির, মসজিদ, মুদ্রা ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়, বৌদ্ধ বিহার খনন করা হয়, লুপ্ত নগর পুনরুদ্ধার করা হয় এবং ইতিহাসের অনেক উপকরণ আবিষ্কৃত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত উপকরণ নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করা হয় এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্ধকার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্বচ্ছ হয়ে

উঠে। উপরে যে ব্রাহ্মী লিপির কথা বলা হয়েছে, তার পাঠোদ্ধারও করেন একজন ইংরেজ – জেমস্ প্রিন্সেপ। তিনি সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর সাধনা করে এই লিপির পাঠোদ্ধার করেন। অশোকের সময়ের আর একটি লিপি ছিল খরোষ্ঠী, তার পাঠও উদ্ধার করেন ইংরেজরা। এমন কি সংস্কৃত, প্রাকৃত এবং আরবি-ফারসি শিলালিপি বা তাম্রলিপির পাঠও প্রথমে ইংরেজরা উদ্ধার করেন, পরে ভারতীয়রা বা বাঙালিরা এই সব শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা ইত্যাদির পাঠোদ্ধারে পারদর্শী হয়ে উঠেন। ইংরেজ শাসনের অনেক সুফল ও কুফলের মধ্যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার একটি কল্যাণকর দিক।

সংগৃহীত উপকরণ, যেমন শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য এবং অন্যান্য শিল্পের নিদর্শন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন হয় সংগ্রহশালা এবং এই সংগ্রহশালাই মিউজিয়ম বা বাংলায় জাদুঘর নামে পরিচিত হয়। গ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবী মিউজ-এর নামানুসারে মিউজিয়ম, অর্থাৎ মিউজিয়ম হচ্ছে জ্ঞানের সংগ্রহশালা বা আধার। মিউজিয়মকে বাংলায় জাদুঘর কেন বলা হয় আমি জানি না, জাদুঘর শব্দের ব্যুৎপত্তিও আমার জানা নাই। কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির ভবনটি তৈরি হয় ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে; প্রথমে ১৮১৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির ঐ ভবনেই ভারতীয় জাদুঘর বা Indian Museum কাজ শুরু করে। ভারতীয় জাদুঘরের বর্তমান বিশাল ভবনটি পরে তৈরি হয় এবং ঐ নতুন ভবনে জাদুঘর স্থানান্তরিত হয় ১৮৭৫ সালে। বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগটি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, ভারত বিভাগের পরে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে বাংলাদেশে এই বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে অবস্থিত প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট বা স্থানসমূহ এবং সাইট জাদুঘরসমূহ নিয়ে এই বিভাগ যাত্রা শুরু করে।

অপ্রিয় এবং অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলতে হয় যে, আমাদের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখনও দুর্বল। ১৯৪৭ সালের বিভাগ-পূর্ব আমলেই এতদঞ্চলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সীমিত। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সোনারগাঁয়ের পূর্বে কখনও আসেন নি। ফলে পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় এবং কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ-মন্দিরই বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আওতায় আসে। পাকিস্তানি আমলে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য অবদান ময়নামতির খনন কাজ এবং বিহার ও পুরাকীর্তি আবিষ্কার এবং বাংলাদেশ আমলে একমাত্র অবদান সীতাকোটে খনন কাজ এবং আলা-উদ-দিন হোসেন শাহের মাদ্রাসার ভিত্তি ও শিলালিপি আবিষ্কার। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে দক্ষ জনশক্তির অভাব নাই, উচ্চ ডিগ্রিধারী বেশ কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি রয়েছেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁদের পাণ্ডিত্য গবেষণায় এবং প্রকাশনায় এযাবৎ প্রতিফলিত হয় নি। ময়নামতি খনন কাজের সম্পূর্ণ রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নি। কয়েক বৎসর আগে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড থানার ছমিলপুরে কান্তিদেবের দুইখানা তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তাম্রলিপি দু'টি আমাদের ইতিহাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কান্তিদেব ছিলেন নবম শতকে হরিকেল বা দক্ষিণ পূর্ব বাংলা বা চট্টগ্রাম-নোয়াখালী-কুমিল্লার রাজা। এই দুইটি তাম্রলিপি এখনও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে বাক্স-বন্দী হয়ে আছে, প্রকাশনার উদ্যোগ নাই।

বাংলাদেশে জাদুঘরের ইতিহাস আরও করুণ। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সাইট মিউজিয়ম বাদ দিলে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এতদঞ্চলে বেসরকারিভাবে দুটি মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়, রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর এবং ঢাকা জাদুঘর। দিঘাপতিয়ার জমিদার শরৎ কুমার রায়ের উৎসাহে এবং অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় প্রমুখ রাজশাহীর কয়েকজন ইতিহাস অনুরাগী পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় বরেন্দ্র জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১০ সালে। প্রত্ন সামগ্রী সংগ্রহ ও সংরক্ষণে এবং গবেষণায় ও প্রকাশনায় এই জাদুঘর অনন্য অবদান রাখে। কিন্তু পাকিস্তানি আমলে এই জাদুঘর আর্থিকভাবে বিপন্নগ্রস্ত হয়। হিন্দু পণ্ডিতেরা রাজশাহী ত্যাগ করার ফলে গবেষণাও ব্যাহত হয়। বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনায় জাদুঘর তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাওয়ার চেষ্টায় আছে। ঢাকার জেলা প্রশাসক র‍্যাম্কিন, হাকিম হাবিবুর রহমান, ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং আরও কয়েকজন ইতিহাস রসিকের প্রচেষ্টায়, ১৯১৩ সালে ঢাকা জাদুঘর স্থাপিত হয়। পরে এই জাদুঘর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালে মৃত্যু পর্যন্ত ভট্টশালী ঢাকা জাদুঘরের সার্বক্ষণিক কিউরেটর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বলতে গেলে তাঁর একক প্রচেষ্টায় জাদুঘর আশাতীত উন্নতি লাভ করে। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রত্নসামগ্রী সংগ্রহ করেন, নিজে গবেষণা করেন এবং বেশ কিছু প্রামাণ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন। তাঁর প্রকাশিত পুস্তকসমূহ দেশে-বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে। ভারত উপমহাদেশের অনেক সরকারি জাদুঘরের তুলনায় এই বেসরকারি জাদুঘরটি ছিল অতি নগণ্য, কিন্তু প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও প্রকাশনার ভিত্তিতে এই ছোট জাদুঘরটি ব্রিটিশ ভারতে একাদশ স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে এই জাদুঘর জাতীয় জাদুঘর রূপে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, বর্তমানে এর একটি আলিশান ভবন হয়েছে, কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা অনেক, কিউরেটর পদটি প্রথমে ডাইরেকটর বা পরিচালক এবং বর্তমানে ডাইরেকটর জেনারেল বা মহাপরিচালক পদে উন্নীত হয়েছে। জাদুঘরে প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ আশাতীতভাবে বেড়েছে কিন্তু প্রায় সামগ্রী বাক্স-বন্দী, গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে অবদান আশানুরূপ নয়। বর্তমানে একজন বিসিএস অফিসার জাদুঘরের মহাপরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত। জাদুঘর যে একটি সাধারণ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি যে একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান, গবেষণা এবং প্রকাশনাই যে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য তা ব্যর্থ হতে যাচ্ছে। জাদুঘরের কর্মকর্তাদের মধ্যে বেশ যোগ্য ব্যক্তি আছেন, কিন্তু কোন অদৃশ্য কারণে জাদুঘরের গবেষণা ও প্রকাশনা আশানুরূপ হচ্ছে না। সম্প্রতি জাদুঘরে গিয়ে দেখি যে, একটি বিরাট কক্ষে দুইটি বড় বড় হাতি বানিয়ে রাখা হয়েছে। ছেলে মেয়েদের হাতি দেখার জন্য চিড়িয়াখানা থাকা সত্ত্বেও জাদুঘরে হাতি বানিয়ে রাখার কারণ বোধগম্য নয়। আর একটি কক্ষে বিরাট দুইটি নৌকা বানিয়ে রাখা হয়েছে। শহরের উপকণ্ঠে গেলেই যেখানে নৌকা দেখা যায়, সেখানে জাদুঘরে নৌকা রাখাও বিসদৃশ ঠেকে। বাংলাদেশে নৌকা নির্মাণ শিল্প অতি প্রাচীন, প্রাচীন বা মধ্যযুগে বাংলার যুদ্ধ-নৌকা ইতিহাসে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এই নৌকার ঐতিহাসিক বিবর্তন ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন প্রকারের নৌকার রেপলিকা বা প্রতীক নির্মাণ করে রাখলেও দর্শনার্থীরা আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভ করতে পারত। সম্প্রতি পত্র-পত্রিকায় দেখা যায় যে, জাদুঘরের মিলনায়তনে রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সভা এবং নাচ গানের জলসা অনুষ্ঠিত হয়। জাদুঘরের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে এইগুলির কী সম্পর্ক রয়েছে তা বোধগম্য নয়। যেখানে রীতিমত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এবং প্রবন্ধ পাঠ হওয়া উচিত, সেখানে সভা এবং নাচ-গানের জলসা হওয়া মোটেই সমীচীন নয়। এই সকল অনুষ্ঠানের জন্য ঢাকা শহরে মিলনায়তনের অভাব আছে বলে মনে হয় না।

আগেই বলেছি স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম প্রমুখ প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সোনারগাঁয়ের পূর্ব দিকে আসেন নি। এতদঞ্চলের প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ ছিল না। তাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরে আমরা ইতিহাস বিভাগ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. আজিজুর রহমান মল্লিকের তত্ত্বাবধানে আমরা ইতিহাস বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকেরা এই কাজে ব্রতী হই এবং কিছু কিছু প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ করি। আমাদের প্রথম ব্যাচের ছাত্র জনাব শামসুল হোসাইন বর্তমানে এই জাদুঘরের কিউরেটর পদে অধিষ্ঠিত। আমরা জাদুঘরের জন্য যা করেছিলাম তাতে আত্মতৃপ্তির কোন

অবকাশ নাই। আমরা শুধু সূচনা করেছিলাম। কিন্তু বর্তমানে জাদুঘর জন্মলগ্ন অতিক্রম করে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতিতে আমি গৌরব বোধ করি। জাদুঘরের কর্মকাণ্ড কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় যেমন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা। আমি জানতে পেরেছি যে জাদুঘরের সংগ্রহ খুব নগণ্য নয়, বেশ কিছু পাণ্ডুলিপি, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ, শিলালিপি, ভাস্কর্য, টেরাকোটা, মুদ্রা ইত্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। আমি আশা করব যে, এই সকল বিষয়ে গবেষণালব্ধ ফল শীঘ্রই আমাদের হাতে আসবে।

জনাব শামসুল হোসাইনের নেতৃত্বে জাদুঘর আরও উন্নতি করবে, এই বিশ্বাস নিয়ে আমি জাদুঘরের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি কামনা করি।

ধন্যবাদ।

১০ আগস্ট ১৯৯২

উদ্বোধনী ভাষণ

সিরাজুল হক

بسم الله الرحمن الرحيم

মাননীয় সভাপতি এবং উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ, আসসালামু আলাইকুম।

আজ আমরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের নতুন ভবনে স্থায়ী প্রদর্শনী উদ্বোধন উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছি। আমার মত একজন অজ্ঞ লোককে এই মহৎ কর্ম উদ্বোধনের জন্য আহবান করা হয়েছে। আসলে আমি এর উপযুক্ত নই। আপনারা আমাকে বয়োবৃদ্ধ বলেই ডেকেছেন, জ্ঞানবৃদ্ধ বলে নয়।

মিউজিয়মকে আমরা বাংলায় জাদুঘর বলে থাকি। মিউজিয়ম শব্দ দ্বারা এমন একটি প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয় যেখানে মানব কৃষ্টি ও সভ্যতার নানাবিধ নতুন ও পুরাতন নিদর্শনাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে প্রদর্শন, গবেষণা ও উপভোগের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান কালে মিউজিয়ামকে Visual educational institution বা "বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষালয়" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

Museum শব্দটি গ্রিক শব্দ Mouseion থেকে ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় গৃহীত হয়েছে। গ্রিক ভাষায় Mouseion বলতে ধর্মীয় দেবী Muse (মিউজ)-এর আবাস মন্দিরকে বুঝায়। এই দেবী তদানীন্তন কাব্য ও সঙ্গীতাদির নয়জন গ্রিক অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের যে কোন একজন।

প্রাথমিক পর্যায়ে মিউজিয়ম নাম দ্বারা বিশেষ দেবালয়কে বুঝানো হলেও পরবর্তীকালে এ নামের ব্যবহারে শিথিলতা লক্ষ করা যায়। আধুনিক কালে মানব কৃষ্টি ও সভ্যতার নিদর্শনাদির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শনালয়কে মিউজিয়ম বলা হয়।

প্রাচীন নির্শনাদির সংরক্ষণাগার হিসেবে মিউজিয়মকে চিহ্নিত করলে ইতিহাসে এর প্রথম সূচনা লক্ষ করা যায় মিশরের ফিরাউন শাসকদের সময়ে নির্মিত পিরামিডে। প্রাচীন মিশরবাসীরা তাদের রাজ পরিবারের সদস্যদের মৃতদেহ তেষজ আরক দ্বারা সিক্ত করে মমিরূপে পিরামিডের মধ্যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতো। হযরত মুসা (আ.)-এর সমসাময়িক ফিরাউন শাসক ২য় রামসেস-এর মৃতদেহের মমি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন :

"আজ আমি তোমার দেহটি রক্ষা করিব, যাহাতে তুমি তোমার পরবর্তীদিগের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক। অবশ্যই মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার নিদর্শন সম্বন্ধে গাফিল।"

পিরামিডের মধ্যে ফিরাউন রাজবংশীয় বিশেষ বিশেষ রাজার মৃতদেহ মমিরূপে সংরক্ষণ করে তাঁদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জিনিসপত্র এমন কী তাঁদের দাস-দাসী ও নর্তকীদের শবদেহও তাদের পাশে সংরক্ষণ করা হতো। এ সব মমির অনেকগুলো বর্তমানে এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার মিউজিয়মে নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে। পিরামিড সমসাময়িক কালের ব্যক্তি ভিত্তিক জাদুঘর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সকল চরিত্র বহন করলেও আধুনিক পণ্ডিতেরা এটা জাদুঘর হিসেবে চিহ্নিত না করে Historical Monument বা ঐতিহাসিক কীর্তি বলেই মনে করেন।

আর্কিওলজিস্টদের মতে বেবিলনের রাজা নাবোনিদাস (৫৫৫-৪৩৮ খ্রি.পূ.) কর্তৃক নির্মিত প্রতিষ্ঠানটিই পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন জাদুঘর। তিনি বেবিলনের প্রাচীন ধ্বংস প্রাপ্ত কীর্তির নিদর্শনগুলোকে খননের মাধ্যমে উদ্ধার করে বিশেষ স্থানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন বলেই তাঁকে প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘরের জনক বলে অভিহিত করা হয়। বেবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান পৃথিবীর প্রাচীনকালের সপ্তম আশ্চর্যের অন্যতম।

মিউজিয়মের সত্যিকার ধ্যান-ধারণা ও বাস্তবায়ন হয় রেনেসাঁ-উত্তর ইউরোপে। স্যার হ্যানস স্লোনের (Sir Hans Sloane) ব্যক্তিগত সংগ্রহের ভিত্তিতে ১৭৯৩ সালে প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ম, ১৭৯৭ সালে বার্লিনের কাইজার ফ্রেডারিক মিউজিয়ম এবং ১৮৫২ সালে লেনিনগ্রাডের হার্মিটেজ মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয় ব্রিটিশ আমলে ১৮১৪ সালে কোলকাতায়। এর প্রথম নাম ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি মিউজিয়ম। পরে এর নামকরণ করা হয় ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম অব ক্যালকাটা। এর পর থেকেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে জাদুঘর স্থাপিত হতে থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্যে সর্ব প্রাচীন জাদুঘর হচ্ছে রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম। এটি স্থাপিত হয় ১৯১০ সালে। ঢাকা জাদুঘর স্থাপিত হয় ১৯১৩ সালে এবং ঢাকার বলধা মিউজিয়ম ১৯২৫ সালে।

কোন কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সভ্যতা বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার জন্য তৎকালে নির্মিত মূল নিদর্শন ও কীর্তির চেয়ে বেশি নির্ভরশীল তথ্য আর কিছুই হতে পারে না। আর এ কারণেই উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক জ্ঞানদানের জন্য মিউজিয়ম স্থাপন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের জাদুঘরগুলোতে আমাদের মহিলাদের প্রাচীন মডেলের বস্ত্র সামগ্রী ও অলংকারাদি সংরক্ষণ করা হলে এর মাধ্যমে আমাদের অতীত কৃষ্টি ও সভ্যতা খুঁজে পেতে পারি।

বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য রয়েছে ঢাকা জাদুঘর, বর্তমানে জাতীয় জাদুঘর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ম। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন স্থায়ী জাদুঘর ছিল না। আজ এই নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনের মাধ্যমে সে অভাব পূরণ হতে যাচ্ছে। এখন থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক তথা সাধারণ গবেষক ও দর্শকেরা এই জাদুঘর থেকে উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরটি অবশ্যই চট্টগ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। আমি মনে করি, চট্টগ্রাম শহরটিই একটি বিশাল প্রাকৃতিক জাদুঘর। এখানে রয়েছে অসংখ্য সুফি-সাধকের মাজার ও আস্তানা, নয়নাভিরাম বনাঞ্চল, পাহাড়, টিলা আর সমুদ্র সৈকত। তাছাড়া এখানে আছে হিন্দু, বৌদ্ধ ও উপজাতীয়দের নানাবিধ স্থাপত্য ও শিল্পকীর্তি। সব কিছু মিলে এর যে ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়েছে তাতে একে Open Air Museum বলে অভিহিত করা যায়। চট্টগ্রামের ইতিহাস তথা প্রাচীন কীর্তি ও সুফি সাধকদের মাজারের উপর গবেষণার কাজ অতীতেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে। ১৯৮৫ সালে মরহুম ড. শিহাবুল হুদা "The Saints and Shrines of Chittagong" শীর্ষক একটি মূল্যবান থিসিস লিখেছেন। আমার জানামতে বইটিতে মৌলিক তথ্যাদি সন্নিবেশিত হয়েছে। বইটি প্রকাশিত হলে পাঠক সমাজ চট্টগ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে আমি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে থিসিসটি ছাপানোর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত এই মিউজিয়ম এতদঞ্চলের অতীত সভ্যতা ও কৃষ্টির ঐতিহ্যবাহী নিদর্শনাদি দ্বারা সমৃদ্ধ হবে এবং দেশ তথা চট্টগ্রামবাসী তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ পাবে। আমি এই মিউজিয়মের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করে এর স্থায়ী প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি এবং মহান আল্লাহর দরবারে এর সার্বিক উন্নতির জন্য দোয়া করছি। আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন।

১০ আগস্ট ১৯৯২

সভাপতির ভাষণ

রফিকুল ইসলাম চৌধুরী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের স্থায়ী প্রদর্শনীর সম্মানিত উদ্বোধক প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল হক, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সহকর্মী বন্ধুরা ও সমবেত সুধীবৃন্দ,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের স্থায়ী ভবনের আঙিনায় আজকের অনুষ্ঠানে প্রত্নপ্রেমী সুধীজনকে একত্রিত করতে পেরে আমরা আনন্দিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়ত অনেক কিছুই নেই। কিন্তু আপনারা জেনে নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছেন যে, আমাদের একটি জাদুঘর আছে যা অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই নেই। উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে গবেষণার নিবিড় সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাদুঘর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্য সামনে রেখে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ ও সংস্কৃতির এবং এ-অঞ্চলের মানুষের শ্রমে সৃষ্ট নানা শিল্প-নিদর্শন গবেষণা ও প্রদর্শনের জন্যে সংগ্রহ করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর। শুধু শিল্প নিদর্শন নয় জীববিদ্যা বিষয়ক এবং ভূতাত্ত্বিক কিছু নিদর্শনও আছে এই জাদুঘরের সংগ্রহে। মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞানের গবেষকরা যেমন এ জাদুঘরের সংগ্রহ ব্যবহার করেন পাশাপাশি বিজ্ঞান অনুষদেরও কয়েকজন গবেষক জাদুঘরের সংগ্রহ ব্যবহার করছেন জেনে আমি নিজেও অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি।

আমাদের দেশের কোথাও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সময়কাল নিয়ে গবেষণাগারের ব্যবহার হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের সহায়তায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণাগারে কার্বন-১৪ পদ্ধতিতে এই গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে। জাদুঘরে সংগৃহীত কিছু ফসিল প্রত্নতাত্ত্বিক সময়কাল নির্ণয়ের গবেষণায় ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরে সংগৃহীত কিছু লুপ্তপ্রায় প্রাণীর জৈব নিদর্শনের উপর গবেষণার কাজ হাতে নিয়েছেন প্রাণীবিদ্যা বিভাগের একজন শিক্ষক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যার আধিক্য, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এবং রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যার আবর্তে উচ্চ শিক্ষা আজ বিপর্যস্ত। সুতরাং গবেষণার মাধ্যমে বিদ্যা-উৎপন্ন করার কাজও বিঘ্নিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে। মৌলিক এবং ফলিত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সামনে রেখে উপাত্ত-উপাদান সংগ্রহের কাজে জাদুঘর বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতে পারে। দেশে এ ধরনের সংগ্রহ সমৃদ্ধ করা গেলে উচ্চশিক্ষা ও উচ্চতর গবেষণার জন্যে বিদেশ যাওয়ার প্রয়োজনও অনেকাংশে লাঘব হবে এবং দেশের মধ্যেই গবেষণার সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার তেমন সুযোগ সৃষ্টি করা এখনো সম্ভব হয়ে উঠে নি। সে কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি জাদুঘর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে স্বাভাবিকভাবেই কর্তৃপক্ষ একে স্বাগত জানায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে জাদুঘরের মতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যে কত কঠিন ও শ্রমসাধ্য কাজ এর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই তা গভীরভাবে অনুভব করেন, বিশেষ করে একটি 'একাডেমিক মিউজিয়ম' গড়ে তোলার মত দুরূহ কাজ। প্রত্নতত্ত্ব এবং জাদুঘরবিদ্যায় প্রশিক্ষিত নিষ্ঠাবান কর্মীর অভাবে একাজে অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠছে না।

প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিদ্যায় প্রশিক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থা দেশের কোন প্রতিষ্ঠানে এখনও নেই। বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে প্রত্নতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক নিদর্শন সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার কোন উদ্যোগ না থাকায় আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের এসব অমূল্য নিদর্শন সম্পর্কে এক ধরনের উদাসীনতা শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও দুঃখের সঙ্গে লক্ষ করা যায়। অথচ জাতীয় চেতনার সমৃদ্ধি ও লালনের জন্যে বিশ্বের যে কোন অগ্রসরমান সমাজে প্রত্নতত্ত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে অনুশীলন করা হয়। কেননা এ বিষয়টি এখন বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার নানা ক্ষেত্রে অধিগমন করে একটি সমৃদ্ধ অধীতব্য বিষয়ে পরিণতি লাভ করেছে।

দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ও প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাবে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে অনেক প্রত্ননিদর্শন এখনও চিহ্নিত হওয়ার অপেক্ষায় আছে। বিশেষ করে চট্টগ্রাম বিভাগের ক্ষেত্রে এ অবস্থা শোচনীয়ই বলা যায়। ব্রিটিশ আমলে স্যার আলেকজান্ডার কানিংহামের নেতৃত্বে এই উপমহাদেশে প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলনের সূচনা হয়। কানিংহাম বাংলাদেশের সোনারগাঁ অঞ্চল পর্যন্ত জরিপ করেন এবং এর বিবরণ প্রকাশ করেন। এই অবস্থায় চট্টগ্রাম বিভাগ তার প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ-প্রকল্প থেকে বাদ পড়ে যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের অংশ গ্রহণের সুযোগ রেখে কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে দেশের প্রত্নসম্পদ রক্ষার কাজে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলোতে প্রায়ই পুরাকীর্তি পাচারের সংবাদ ছাপা হয়। বিদেশের বড় বড় শিল্প-নিদর্শন নিলামকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রকাশ্যে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে আমাদের দেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন নিলামে বিক্রি করেন। এসব অপকর্ম পুরাকীর্তি আইন (Antiquities Act) অনুযায়ী দন্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু উন্নত দেশের এই প্রতিষ্ঠানগুলো কী করে আইন বিরোধী কাজ করে পার পেয়ে যাচ্ছে তা বোঝা মুশকিল। একটি অবহিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী পুরাকীর্তি পাচার ঠেকানোর কাজে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে পারেন। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক প্রশিক্ষণ চালু করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যাল জাদুঘর প্রত্নতত্ত্বে অবহিত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টির কাজে সহায়তা করতে পারে।

যাঁদের প্রচেষ্টায় এবং অবদানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায় জাদুঘর আজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, আমার বক্তৃতা শেষ করার আগে তাঁদের সবাইকে আমি আপনাদের সকলের তরফ থেকে সাধুবাদ জানাতে চাই। এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা কত পরিশ্রমের কাজ সে কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। কোন কাজের চেয়েই স্বীকৃতি বড় হতে

পারে না তবে সমাজের নিজের প্রয়োজনেই কাজের লোকদের স্বীকৃতি না দিলে সে সমাজই বন্ধ্যা থেকে যায়। এতে সমাজ এবং ব্যক্তি উভয়েরই ক্ষতি হয়।

আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আমাদেরই অনেকের শিক্ষক ঢাকা জাদুঘরের প্রাক্তন কিউরেটর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ইমেরিটাস ড. সিরাজুল হক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘরের স্থায়ী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে সম্মত হওয়ায় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তাঁর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করি।

আজ থেকে এই জাদুঘর আরও নবোদ্যমে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে নিজস্ব অবদান রাখার প্রয়াস গ্রহণ করুক এবং জাদুঘরের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

১০ আগস্ট ১৯৯২

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস বক্তৃতা

জাদুঘর লবি
১৮ মে ২০০২

নলিনীকান্ত ভট্টশালী : আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে শ্রদ্ধা নিবেদন

আবদুল করিম

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবসে ঢাকা জাদুঘরের স্বনামখ্যাত আজীবন কিউরেটর, স্বর্গীয় ড. নলিনীকান্ত ভট্টশালীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পেরে আমি আনন্দিত। ঢাকায় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পরে ১৯১৪ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৪৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি তারিখ সকালে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি জাদুঘরের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে, প্রসারে ও প্রশাসনে এবং বাংলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য গবেষণায় যে ভাবে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, তাতে এই দিনে তাঁকে স্মরণ করা উপযুক্ত বিবেচনা করি। ঢাকা জাদুঘর এখন বাংলাদেশের জাতীয় জাদুঘরে পরিণত, একটি আলীশান ভবনে স্থানান্তরিত, সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত, কিন্তু ভট্টশালীর সময় না ছিল প্রশস্ত ও সুউচ্চ ভবন, না ছিল আর্থিক স্বচ্ছলতা; বর্তমানে জাদুঘরের প্রধান ডাইরেক্টর জেনারেল বা মহাপরিচালক রূপে পরিচিত। কিন্তু ভট্টশালী ছিলেন একজন মডেস্ট কিউরেটর। ভট্টশালীর একাগ্র এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়, নিরলস পরিশ্রমে জাদুঘর যেরূপ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্তমানে তার চেয়ে খুব বেশি অগ্রসর হতে পারে নি; ভবন যেরূপ প্রশস্ত এবং সুউচ্চ হয়েছে, গবেষণা সেইরূপ সুনাম রক্ষা করতে পারে নি, বরং গবেষণা নির্বাসিত হয়েছে। ভট্টশালী তাঁর ইতিহাস-ঐতিহ্য গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে জাদুঘর আন্দোলনের ইতিহাসে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্থান দখল করে নিয়েছেন।

আমাদের দেশে জাদুঘর আন্দোলন ইংরেজ শাসনের অবদান। ইংরেজেরা এই দেশ শাসন শোষণ ও লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে আধুনিকতার বীজও বপন করেছে। এর একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার, চর্চা ও গবেষণা এবং জাদুঘর প্রতিষ্ঠা। ভারত উপমহাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ছিল, সেই যুগের জনগণ বিভিন্নভাবে তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রমাণ রেখে গেছে; বিহার, চৈত্য, স্তূপ, মন্দির, মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, পুল ইত্যাদি নির্মাণ করে ধর্মীয় ভাব যেমন জাগ্রত রেখেছে, তেমনি শিল্পী মনেরও পরিচয় রেখে গেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে লুপ্ত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা দেখা যায় না, এই টেকনিক তাদের জানা

ছিল না। দিল্লির সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক প্রচুর অর্থব্যয়ে এবং অনেক লোকলশকর লাগিয়ে সম্রাট অশোকের প্রতিষ্ঠিত দুইটি স্তম্ভ প্রত্যন্ত এলাকা থেকে রাজধানী দিল্লিতে এনে পুনঃস্থাপন করে ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগের প্রমাণ দেন।

মিউজিয়াম শব্দটি আসলে ল্যাটিন থেকে ইংরেজিতে আসে, এর প্রতিশব্দ জাদুঘর। কিছুদিন আগেও জাদুঘরকে যদুঘর রূপে লেখা হত, ইহা যাদু বা ম্যাজিক এর সঙ্গে সম্পর্কিত। পাকিস্তানী আমলে উর্দুতে লিখা হত আযায়েবখানা, যেন এটি অতীব আশ্চর্যজনক বস্তুর স্থান। প্রকৃতপক্ষে গ্রিক মিউজ থেকে মিউজিয়াম শব্দ; গ্রিক পৌরাণিক দেবী জিউসের নয়জন কন্যা। তাঁরা কাব্য, সাহিত্য, নৃত্য, ইতিহাস এবং অন্যান্য বিদ্যায় উৎসাহদাত্রী রূপে পরিচিত ছিলেন। আমাদের দেশে যেমন সরস্বতী বিদ্যার দেবী এবং লক্ষ্মী ধনসম্পদের। অতএব মিউজিয়াম বা জাদুঘর এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে জ্ঞানের ভাণ্ডার, অর্থাৎ কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য, ইতিহাস এবং অন্যান্য কলা বিষয়ক উপাদান সংগৃহীত হয়, সংরক্ষণ করা হয় এবং সেই সবের চর্চার ব্যবস্থা করা হয়। অতএব জাদুঘর হল জ্ঞানের ভাণ্ডার, প্রদর্শ-শালা এবং সংগ্রহ ও সংরক্ষণশালা।

আই. এ. পাশ করা পর্যন্ত মিউজিয়াম বা জাদুঘর শব্দ আমার জানা ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে প্রথম কিছুদিন ক্লাস করি ঢাকা হলের কক্ষে এবং ফজলুল হক হল ও রেলওয়ে হাসপাতালের মাঝামাঝি অবস্থিত একটি দোতলা লাল দালানে, রুটিনে লিখা ছিল পি. ডব্লিউ. ডি. অর্থাৎ এই দালানে আগে গণপূর্ত বিভাগের অফিস ছিল। এই দালান থেকে বের হয়ে ডান দিকে ঘুরে প্রথমে বাবুপুরা পুলিশ ফাঁড়ি এবং তার পরে কিছু এলাকা জুড়ে জাদুঘর, একতলা ভবন, তার পশ্চিমে দোতলা গেট, জাদুঘরের অফিস। সাইনবোর্ড দেখেই বুঝি এটা জাদুঘর, তবে এটি কী ও কেন তখনো জানতাম না। একদিন কৌতূহলবশত ভিতরে গিয়ে দেখি কিছু ভাস্কর্য, আরবি ফারসি শিলালিপি, কিছু শুকিয়ে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত অজগর ও অন্যান্য প্রাণী, এবং অনান্য কিছু ছেলেমেয়েদের চিত্তাকর্ষক জিনিসপত্র। জাদুঘর আমাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি, তখনো বুঝি নি যে এই জাদুঘরই হবে আমার অত্যন্ত প্রিয় স্থান।

১৯৪৭-এর প্রথম দিকে একদিন ক্লাসে যাচ্ছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেইন গেটে পৌঁছে দেখি ছাত্র-শিক্ষকদের অনেকেই হন্তদন্ত হয়ে জাদুঘরের দিকে যাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি জাদুঘরের কিউরেটর ড. ভট্টশালী মারা গেছেন। তখন জাদুঘরের কথা জানি, কিন্তু কিউরেটর শব্দ জানা ছিল না, ভট্টশালী নামটিও অবাক করে দেয়। ভাবলাম ভট্টাচার্য বোধ হয়, ভুলে ভট্টশালী শুনেছি। এম. এ. ফাইনাল ক্লাসে আমাদের একটি বিষয় ছিল ইম্পেরিয়াল গুপ্ত ও প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস। বিষয়টি পড়াবার শিক্ষক ছিলেন না, পাকিস্তান হওয়ায় অনেক যোগ্য হিন্দু শিক্ষক ভারতে চলে যান; এই বিষয় পড়াতেন ড. ডি. সি. গাঙ্গুলী, তিনিও ভারতে চলে যান কিন্তু তাঁর স্থলে নিয়োগ দেওয়ার মত কোন যোগ্য লোক পাওয়া গেল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংকৃত সেকশনের দায়িত্বে ছিলেন বাবু সুবোধ ব্যানার্জি, ভট্টশালীর মৃত্যুর পরে তিনি জাদুঘরের দায়িত্বেও নিযুক্ত হন। তাঁকে এই বিষয়টি পড়াবার জন্য নিযুক্ত করা হয়। তিনি আমাদের জাদুঘরে নিয়ে কয়েকটি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ করেন, ভাস্কর্য নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। তখনই জাদুঘর কী ও কেন বুঝতে পারি, আরও বুঝতে পারি যে মিউজিওলজি বা জাদুঘরবিদ্যাও একটি মূল্যবন পাঠ্য বিষয়।

ভারত উপমহাদেশে প্রথম জাদুঘর স্থাপিত হয় কোলকাতায়। প্রখ্যাত মনীষী, প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ কোলকাতা সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি স্যার উইলিয়াম জোন্সের নেতৃত্বে কোলকাতার ইউরোপীয় জ্ঞানী-গুণীদের সমর্থনে ১৭৮৪ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটি (পরে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল) প্রতিষ্ঠিত হয়। গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসও সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জোনস্ এশিয়ার তাবত জ্ঞান ভাণ্ডারকে ১৬টি শাখায় বিভক্ত করেন এবং সেভাবে জ্ঞান চর্চার একটি রূপরেখা তৈরি করেন। সোসাইটিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক, প্রাণীবিদ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক নিদর্শন আবিকৃত হয় এবং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ভবন নির্মিত হয়। এই ভবনই হল প্রথম জাদুঘর, পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনের পাশেই একটি ভবন জাদুঘরের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়। ১৮৬১ সালে ভারত সরকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে, স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এই বিভাগের প্রথম ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ পুরোদমে চলতে থাকে এবং বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম সভ্যতার অনেক নিদর্শন আবিকৃত হয়। বিভিন্ন স্থানে খনন কাজ করে সভ্যতার প্রাচীন পীঠস্থান, বিহার, স্তূপ, মন্দির, শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা, সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদান ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে আবিকৃত হয়। ফলে বিভিন্ন স্থানে জাদুঘর স্থাপিত হয়, কোলকাতায় এত অধিক পরিমাণ নিদর্শন আসতে থাকে যে, সেখানে একটি বিশাল আকারের ভবন নির্মাণ করতে হয়, ইহাই ১৮৭৫ সালে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম নামে চালু হয়, অর্থাৎ এশিয়াটিক সোসাইটি মিউজিয়াম পরে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয় এবং ইহা একটি ইম্পেরিয়াল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

রাজশাহীতে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি ও বরেন্দ্র রিসার্চ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১০ সালে নিঘাপতিয়ার রাজা বাবু শরৎকুমার রায়ের প্রচেষ্টায়। শীঘ্রই এই জাদুঘর একটি অনন্য সাধারণ জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে পরিণত হয়। বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী গৌড়-পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী হওয়ায় এই জাদুঘরের সংগ্রহও হয় বিশাল এবং এটি গবেষণার উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৩ সালে। লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ করে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠন করে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন কিন্তু হিন্দুদের প্রবল আন্দোলনের মুখে বঙ্গ-ভঙ্গ ১৯১১ সালে রহিত হয়ে যায় এবং ঢাকাও রাজধানীর মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। ১৯০৯ সালে ঢাকায় একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়। কিন্তু এই পট পরিবর্তনের ফলে সেই প্রস্তাবও চাপা পড়ে যায়। ১৯১২ সালের ১২ই জুলাই তারিখে ঢাকার গণ্যমান্য এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনার জন্য নর্থব্রুক হলে এক সভার আয়োজন করে, বিভিন্ন হিন্দু-মুসলিম অভিজাত পরিবারের সংগ্রহে থাকা কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন ধার করে এনে সভাস্থলে প্রদর্শন করা হয়। গভর্নর লর্ড কারমাইকেল এই সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি লোকজনের উৎসাহে সন্তুষ্ট হয়ে জাদুঘরের প্রস্তুতির কাজ সমাধার জন্য দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করেন। প্রদর্শনের জন্য আনা ছয়টি ভাস্কর্য ছাড়া বাকি নিদর্শন মালিকদের নিকট ফেরত দেওয়া হয়। এই ছয়টি ভাস্কর্য প্রথমে ঢাকা কালেক্টরেটের একটি কক্ষে রাখা হয়, পরে সরকার সচিবালয়ের (বর্তমান মেডিকেল কলেজ ভবন) একটি কক্ষে রাখার অনুমতি দেয়। ১৯১৩ সালের ৫ই মার্চ তারিখে ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে সরকারি গেজেট প্রকাশিত হয় এবং লর্ড কারমাইকেল ৭ই আগস্ট তারিখে জাদুঘর উদ্বোধন করেন।

ঢাকায় জাদুঘর স্থাপনের প্রথম প্রস্তাব করেন ডি. পি. আই. এইচ-ই-স্ট্যাপলটন; তখন শিলং-এর মুদ্রা ভাণ্ডার আবিকৃত হয় এবং স্ট্যাপলটন নিজে এই ভাণ্ডারের ক্যাটালগ তৈরি করেন, ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়। তখন পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ায় এবং ঢাকায় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তিনি মনে করেন যে, মুদ্রাভাণ্ডার ঢাকায় থাকা উচিত এবং সেই উদ্দেশ্যেই ঢাকায় জাদুঘর প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তখন নিয়ম ছিল যে, কোন মুদ্রা ভাণ্ডার আবিকৃত হলে স্থানীয় জাদুঘরে অধিকাংশ এবং বিভিন্ন পিরিয়ড বা মুদ্রা জারিকারীর প্রতিনিধিত্বশীল মুদ্রা রেখে বাকিগুলি অন্যান্য জাদুঘরে বিলি করা হত, যাতে মুদ্রাভাণ্ডারের কথা মুদ্রাপ্রেমী সকলেই জানতে পারে। স্ট্যাপলটনকে যাঁরা সমর্থন ও সহযোগিতা করেন তাঁরা হলেন জে. টি. রেঙ্কিন, এ. এইচ. ক্লেটন, হাকিম হাবিবুর রহমান খান,

সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, বি. কে. দাশ, সৈয়দ আওলাদ হাসান, সৈয়দ এ. এস. এম. তইফুর, খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ এবং প্রফেসর আর. বি. র‍্যামসবোথাম ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠার পরে প্রথম দিকে স্ট্যাপলটন জাদুঘর পরিচালনা করেন। রেস্কিন এবং ক্লেটন পর পর সভাপতির এবং সৈয়দ আওলাদ হাসান, র‍্যামসবোথাম এবং সত্যেন্দ্র নাথ ভদ্র পর পর কয়েক বৎসর সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু প্রথম কয়েক মাস স্ট্যাপলটন জাদুঘরের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা শিলালিপি ও মুদ্রাতত্ত্ববিদ, অল্প সময়ে তিনি এত বেশি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ করতে সক্ষম হন যে, শীঘ্রই সচিবালয়ে জাদুঘরের জন্য অতিরিক্ত কক্ষ বরাদ্দ করতে হয়। কিন্তু জাদুঘর সগৌরবে আবির্ভূত হয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী কিউরেটরের দায়িত্ব নেওয়ার পরে। তিনি ১৯১৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে ঢাকা জাদুঘরের কিউরেটর নিযুক্ত হন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশে ভট্টশালী এই পদ লাভ করেন।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী তৎকালীন ঢাকা জেলায় ১৮৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রোহিণীকান্ত ভট্টশালী এবং মাতার নাম শরৎ কামিনী দেবী। তাঁর পৈত্রিক বাড়ি বিক্রমপুর পরগণার পাইকপাড়া গ্রামে, কিন্তু তাঁর জন্ম হয় মাতুলালয়ে মুন্সিগঞ্জের নয়নন্দ গ্রামে। চার বৎসর বয়সে নলিনীকান্ত পিতৃহারা হন। ফলে অনেক কষ্ট করে তিনি লেখাপড়া শিখেন এই ব্যাপারে তিনি তাঁর খুল্লতাত অক্ষয়কান্তের সাহায্য পান। অক্ষয়কান্ত স্কুল শিক্ষক হওয়ায় তাঁকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষকতা করতে হয়, তাই নলিনীকান্তকেও বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষা লাভ করতে হয়। তিনি সোনারগাঁয়ের পানাম স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং ঢাকা কলেজ থেকে এফ. এ; বি.এ; এবং এম.এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবনেও তিনি বিভিন্ন কাজ করে লেখাপড়ার খরচ নির্বাহ করতেন এবং ঢাকা কলেজের কয়েকজন শিক্ষকও তাঁকে মাঝে মাঝে সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁর এম.এ. পরীক্ষায় ফলাফল ভাল হল না। তিনি ১৯১২ সালে তৃতীয় বিভাগে পাশ করেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি নলিনীকান্তের প্রবল উৎসাহ ছিল, কাছে দূরে বিভিন্ন স্কুলে পড়তে হওয়ায় তিনি বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে পরিচিত হন, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পুরাকীর্তি দেখে তিনি ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। এম. এ. পাশ করে তিনি কোলকাতায় যান এবং সেখানে গবেষণা শুরু করেন। কোলকাতায় যাওয়ার ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি একখানি শিওতোষ বই লিখে নব্বই টাকায় স্বত্ব বিক্রি করেন, এতে তাঁর যাওয়ার খরচ ছাড়াও সেখানে বেশ কিছুদিন থাকার ব্যবস্থা হয়। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে পি. আর. এস.-এর (প্রেমচাঁদ রামচাঁদ স্কলারশিপ) জন্য থিসিস রচনা করে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেন। সেই বৎসর, অর্থাৎ ১৯১২ সালে, পি. আর. এস.-এর জন্য আরো দুইজন থিসিস জমা দেন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার, দুইজনেই ইতিহাসের দিকপাল এবং ভট্টশালীর সিনিয়র, স্কলারশিপ তিনি পান নি, পেয়েছিলেন রমেশ মজুমদার (বহুগ্রন্থের প্রণেতা এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর)। একটুও হতাশ না হয়ে ভট্টশালী *A Forgotten Kingdom of Eastern Bengal* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন এবং স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট নিয়ে যান। স্যার আশুতোষ যুবক ভট্টশালীকে প্রথমে আমল দিতেই চান নি, কিন্তু অনেক অনুরোধের পরে প্রবন্ধটি পড়ে দেখে বুঝতে পারেন যে, প্রবন্ধটি মৌলিক গবেষণার স্বাক্ষর বহন করে। স্যার আশুতোষের চেষ্টায় ভট্টশালী প্রবন্ধটি এশিয়াটিক সোসাইটির সেমিনারে পাঠ করার সুযোগ পান। প্রবন্ধটি সুধী সমাজে গৃহীত হয় এবং সেই বৎসরই এশিয়াটিক সোসাইটি জার্নালে প্রকাশিত হয়। ভট্টশালীর গৌরবময় গবেষণা জীবনের শুরু হয়। এই প্রবন্ধ পড়ে স্যার আশুতোষ এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি ঢাকা জাদুঘর কমিটির কাছে নলিনীকান্ত ভট্টশালীকে জাদুঘরের কিউরেটর নিযুক্ত করায় সুপারিশ করেন। আগেই বলা হয়েছে, তিনি ঐ পদে যোগদান করেন।

ভট্টশালী পূর্ব বাংলার সন্তান, পূর্ব বঙ্গের মাটি, মানুষ এবং জনপদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান আবিষ্কার ও সংগ্রহের জন্য গ্রামে গ্রামে যখন যেমন প্রয়োজন নৌকায়, ট্রেনে, এবং পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করেন। ফলে অনেক মূর্তি, শিলালিপি, তাম্রলিপি, মুদ্রা এবং প্রাচীন মন্দির আবিষ্কৃত হয়। সম্ভব হলে তিনি নিদর্শন সংগ্রহ করে জাদুঘরে নিয়ে আসতেন এবং প্রায় এ সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে প্রকাশ করে সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। ১৯১২ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রত্যেক বৎসর বিভিন্ন জার্নালে তাঁর একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠার পরে, সেই বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সাইট জরিপ করে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ আবিষ্কার ও সংরক্ষণ করেন, কিন্তু তাদের জরিপ ছিল মূলত প্রাচীন রাজধানী ও বিহার স্তূপকে কেন্দ্র করে। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম গৌড়, পাণ্ডুয়া ও সোনারগাঁ জরিপ করেন এবং বিভিন্ন রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু ভট্টশালী শহর-নগর ছাড়াও প্রত্যন্ত এলাকায়, এমনকি গ্রামে গ্রামে গিয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রম চালান। ভট্টশালীর প্রচেষ্টা না হলে শুধু ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিকদের উপর নির্ভর করলে আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত। ভট্টশালীর অনুসন্ধান ছিল অত্যন্ত ব্যাপক, এবং শ্রমসাধ্য; কোন উপাদান বা নিদর্শনের সংবাদ পেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ছুটে যেতেন এবং নিদর্শন হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত শান্ত হতেন না। পুরাকীর্তি সংগ্রহের নেশার কথা উল্লেখ করে তিনি একবার বলেন :

> মনে অহরহ ইচ্ছা জাগিতেছে যে, স্বহস্তে কোদাল ধরিয়া সমস্ত উচ্চভূমি খুঁড়িয়া সমভূমি করিয়া দিই। প্রাচীন পুকুরগুলিকে প্রাচীন কঠাহের মত ধরিয়া তুলি এবং উল্টাইয়া ফেলিয়া দিই দেখি তাহাদের অভ্যন্তরে কি আছে। কিন্তু দুর্বৃত্ত উদর দুই বেলা যথাসময়ে চৌ চৌ করিয়া জানাইয়া দেয় যে, রাজা অশোকের কটা ছিল হাতি না জানিলেও পৃথিবীর বিশাল ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। তথাপি নেশা 'যারে ধরে তারে পাগল করে'। প্রত্নতত্ত্বের নেশাগ্রস্ত হতভাগ্যগণ আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবেন।

একবার তিনি সংবাদ পান যে, কোন এক গ্রামের পুকুরে একখানি খণ্ডিত তাম্রলিপি ডুবে আছে। তিনি সেটি পাওয়ার আশায় জেলেদের ডেকে সেই পুকুরে জাল ফেলেন এবং তাম্রলিপির আশায় সেই পুকুর পাড়ে এক নাগাড়ে চারদিন বসেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাম্রলিপির খণ্ডিত অংশটি উদ্ধার হয় নি।

নলিনীকান্ত ভট্টশালীর গবেষণা জীবন ১৯১২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত (১৯৪৭-এর ফেব্রুয়ারিতে তাঁর মৃত্যু হয়) ৩৪ বৎসর। এই সময়ে তাঁর প্রকাশিত বই ও প্রবন্ধ নিম্নরূপ :

ইংরেজি গ্রন্থ ৪টি :

1. *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal.*
2. *Iconography of the Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum.*
3. *Catalogue of Coins Collected by Syed A. S. M. Taifoor and Presented to the Dacca Museum.*
4. *Catalogue of Coins Collected by Moulvi Hakim Habibur Rahman Akhunzada of Dacca and Presented to the Dacca Museum.*
5. *Report of the Dacca Museum* ১১টি (১৯৩৫–১৯৪৫ পর্যন্ত)

ইংরেজি প্রবন্ধ ৬৪টি।

বাংলা গ্রন্থ ৮টি :

১. বীর বিক্রম, ইংরেজি ভাষায় ইবসেন লিখিত নাটকের বাংলা রূপান্তর

২. হাসি ও অশ্রু, গল্প গ্রন্থ।

৩. প্রবেশিকা ভারত ইতিকথা।

৪. মূর্খ শতক (কবিতার বই)

৫. আবদুস সুকুর মোহাম্মদ বিরচিত "গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস"।

৬. কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ (আদিকাণ্ড)

৭. ভবানীদাস বিরচিত ময়নামতির গান। বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত সহযোগে।

৮. মীণ চেতন।

বাংলা প্রবন্ধ ১১৫টি

সর্বমোট ১২টি বই ও ১৯০টি প্রবন্ধ, ঢাকা মিউজিয়াম রিপোর্ট সহ। অতএব বই ছাড়াও তিনি গড়ে প্রতি বৎসর সাড়ে পাঁচটির বেশি প্রবন্ধ লিখেন। গবেষণামূলক বই ত অবশ্যই, প্রবন্ধগুলিও উৎকৃষ্ট মানের পরিচায়ক। বাংলা শেষ চারটি বই তিনি সম্পাদনা করেছেন, তিনটি নাথ সাহিত্য, সম্পাদনা কাজেও তিনি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদিকাণ্ড সম্পাদনায় তিনি কৃতিত্বের দাবি করতে পারেন।

ভট্টশালীর সকল বই ও প্রবন্ধের সমালোচনার কাজ সময় ও শ্রম সাপেক্ষ, কোন পি-এইচ. ডি. গবেষক ভট্টশালীর রচনা ও পাণ্ডিত্য নিয়ে গবেষণা করলে সুফল পাবে। ভট্টশালীর দুইটি পুস্তক, *Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum* এবং *Coins and Chronology of the Early Independent Sultans of Bangal* আমি অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি, দুটিই ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদদের দ্বারা আদৃত।

আগে বলেছি বরেন্দ্র জাদুঘর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়। বরেন্দ্রভূমিতে প্রাচীন কালে অনেক সভ্যতা ও জনপদ গড়ে ওঠে, সেই অঞ্চলে প্রাচীন নিদর্শনও প্রচুর পাওয়া যায় এবং বরেন্দ্র জাদুঘরে রক্ষিত হয়। এই কথা চিন্তা করে ভট্টশালী অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে সীমিত রাখেন। ঢাকার সাভার, রামপাল, বজ্র যোগিনী, ফরিদপুরের কোটালীপাড়া, কুমিল্লার লালমাই ময়নামতিতে অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় এবং ভট্টশালী সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত তথ্যের আলোকে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। ভাস্কর্য এত অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হয় যে, ভট্টশালী উৎফুল্ল হয়ে ভাস্কর্যের ক্যাটালগ তৈরির কাজে হাত দেন। তাঁকে উৎসাহিত করেন ঢাকা বিভাগের কমিশনার জে. টি. রেঙ্কিন, অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সুযোগ্য পুত্র বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। এই বই অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় এবং এই বই লিখে এবং আরও কিছু প্রবন্ধ উপস্থাপন করে তিনি ১৯৩৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। এই বইতে ভাস্কর্যের সাহায্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে এবং হিন্দু ভাস্কর্যের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস, পূজার উদ্ভব এবং বিকাশ অতি সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে। বই খানি সুলিখিত এবং সুপাঠ্য, বইখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে এবং ভারতের বাইরের ইন্দোলজিস্টদের (ইন্ডিয়া সম্পর্কিত জ্ঞানের গবেষক) নিকট বিপুল ভাবে সমাদৃত হয়।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী একজন লিপিবিশারদ (Paleographist)ও ছিলেন। লিপি দেখে তিনি প্রাচীন কাব্যের রচনাকাল নির্ধারণ করতে পারতেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যান্য ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতবর্গও লিপিবিদ্যা বিশারদ ছিলেন এবং এই বিষয়ে ভট্টশালীও সুনাম অর্জন করেন। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেন :

> Prof Bhattasali would never budge an inch from any conclusion he had arrived at, which he thought was justified by science and reason. I am reminded specially of a case in which his opinion was sought by a very eminent literary man and journalist of Bengal - about the authenticity of a Bengali manuscript giving a version of the life of the great mediaeval poet of Bengal, Chandidas. .... Prof. Bhattasali through whose hands thousands of Bengali manuscripts had passed, looked closely into the manuscript - its paper, its writing and everything, and came to the conclusion that it was spurious and was not at all as old as it was claimed to be. He sent his dispassionate opinion to the gentleman who had asked for it, even at the risk of displeasing him.

ঢাকা জেলার (বর্তমান নারায়ণগঞ্জ জেলা) রূপগঞ্জে একটি মুদ্রাভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়, মুদ্রাগুলি বাংলার স্বাধীন মুসলিম সুলতানদের আমলের, ফখর-উদ-দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮) থেকে আরম্ভ করে জালাল-উদ-দিন মোহাম্মদ শাহের সময়ে শেষ হয়। ভট্টশালী নিজে মুদ্রাগুলি পরীক্ষা করে একটি অত্যন্ত মূল্যবান বই লিখেন, ১৯২২ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এই বই প্রাথমিক যুগের মুসলমান সুলতানদের কালক্রম নির্ধারণে সহায়ক, সত্যি বলতে কী ইতিপূর্বেকার ভুল কালক্রম ভট্টশালীর এই বই-এ সংশোধিত হয়ে যায়। তিনি যেভাবে প্রত্যেকটি মুদ্রা কঠোরভাবে পরীক্ষা করে পাঠ করেন তা আজ পর্যন্ত মুদ্রাতত্ত্ববিদদের জন্য আদর্শ হয়ে আছে। আমি নিজে তাঁর টেকনিক এবং মুদ্রা পরীক্ষা নীতির দ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছি। এই বইতে ভট্টশালীর আর একটি অবদান রাজা গণেশ ও তৎপুত্র জালাল-উদ-দিনের পরিচিতি নির্ধারণ। রাজা গণেশ নামক একজন হিন্দু জমিদার ইলিয়াস শাহি বংশকে উৎখাত করে নিজে রাজা হন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরই পুত্র যদু জালাল-উদ-দিন নাম ধারণ করে সিংহাসন আরোহণ করায় তাঁর হিন্দু শাসন লোপ পায়। এই কাহিনী তখনো পর্যন্ত ইংরেজ শাসনের প্রথমদিকে লিখিত রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থেই পাওয়া যায়। বইখানিতে আরো লিখিত আছে যে, পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত সুফি নূর কুতব আলমের প্রভাবেই গণেশ তাঁর ছেলে যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে বাধ্য হন। কিন্তু রিয়াজ-উস-সালাতিন ঘটনার প্রায় ৪৭০ বৎসর পরে লিখিত হওয়ায় এবং ইহার সমর্থনে তেমন কোন তথ্য না থাকায় ঐতিহাসিকেরা এই কাহিনী গ্রহণ করতে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু মুদ্রার সাহায্যে ভট্টশালী এই কাহিনীর সত্যতা নিরূপণ করেন। মুদ্রা বিষয়ে ভট্টশালীর অন্য দুটি বইও প্রামাণ্য গবেষণা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নলিনীকান্ত ভট্টশালী বার-ভূঞাদের সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা করেছেন। ১৯২৭-২৮ সালে তিনি *Bengal Chiefs' Struggle for Independence* শিরোনামে বেঙ্গল পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট জার্নালে কয়েকটি খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন, প্রবন্ধগুলি বই আকারে ছাপালে ভাল হত। তাঁর আলোচনার আগে সকলেই মনে করত যে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য ছিলেন এক বীর সৈনিক এবং তিনি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেন। কিন্তু ভট্টশালী এই ধারণা ভুল প্রমাণিত করেন। তিনি বার-ভূঞার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং ইসা খান ও তাঁর ছেলেরাই যে প্রকৃত স্বাধীনচেতা ছিলেন তা প্রমাণ করেন। তাঁর ইতিহাস দর্শন ছিল নির্মোহ। তিনি সত্যকে সত্য বলার এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলার

সাহসী ভূমিকা পালন করতেন। তিনি বলেন :

> We surely want models to guide us in the path of regeneration, - models of heroism, of nobleness, of self sacrifice, and above all, of patriotism. If the past history of our country does not hold any of these upto us, our clear duty is to lead our lives in such a manner that we ourselves may be the models for the future. If, with the best of motives, we attempt to cheat ourselves by believing as true what is not true, if we fail to deal out condemnation in emphatic terms, when condemnation is clearly deserved, I cannot believe that such propaganda history will bring us ultimate good. A true historian should be much above such failings.

নলিনীকান্ত ভট্টশালী ছিলেন একজন দরিদ্র গবেষক, তাঁর পরিবার ছোট ছিল না, তিনি জাদুঘরের কিউরেটর হিসাবে ২০০ টাকায় চাকুরি শুরু করেন, ৩৪ বৎসর পরেও মৃত্যুর আগে তিনি ২৬০ টাকা পেতেন। অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী হয়েও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করতে পারেন নি। যে বিষয়ে না হলেই চলবে না, যেমন প্রাচীন লিপিবিদ্যা এবং ভাস্কর্যবিদ্যা পড়াবার জন্য নগন্য বেতনে তাঁকে ক্লাশ নেওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হত। এইভাবে দারিদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেই ভট্টশালী ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং জাদুঘরের সেবা করে গেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দুই খণ্ডে প্রকাশিত হিস্টরি অব বেঙ্গল গ্রন্থে তিনি কোন লেখা দেন নি, কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেও মতবিরোধের কারণে তিনি সেক্রেটারির পদ থেকে ইস্তফা দেন। অতএব হিস্টরি অব বেঙ্গল তাঁর মূল্যবান অবদান থেকে বঞ্চিত হয়। এই পুস্তকে তাঁর রচনা স্থান না পাওয়ায় আমাদের ক্ষতির পরিমাপ করা এখন সম্ভব নয়, তবে তাঁর লেখা স্থান পেলে যে এই পুস্তক আরো সমৃদ্ধ হত তাতে কোন সন্দেহ নাই। নলিনীকান্ত ভট্টশালী কমেমোরেশন ভল্যুমে সম্পাদক এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ লেখেন :

> Nalinikanta Bhattasali thus gave the whole of his active life to the museum. Although technically only its employee, it was Bhattasali who really built it up and established it reputation. When he took over the museum was only a haphazard collection of sculptures, inscriptions, coins and a few zoological specimens loosely stacked in a 3-roomed store in the old secretariat building. It had no regular income and the staff consisted only of himself and two bearers. His own salary was poor and payment uncertain. But he had found his mission and, with singular devotion and energy he transformed his mufassil museum into an institution of all India fame. He wandered through the country side, exploring, photographing and collecting objects, undertook excavations, gave lectures and organized exhibitions to create local interest in the preservation of antiquities.... He lived with his family in a dilapidated house within the museum compound and his family now recall how he often set up alone in the museum office far into the night, writing reports or deciphering a coin or inscription. Despite the financial worry which a growing family and a poor, uncertain pay naturally caused him, Bhattasali could never think of leaving the museum for a more lucrative position. He had started on a monthly salary of Rs. 200. By the time he died, this had risen only to Rs. 260 and the Museum Comittee could not afford to give him even a small dearness allowance during the war years. Only a passionate love for the institution he had built up sustained hi enthusiasm till the end.

আমার পঞ্চাশ বৎসরেরও বেশি সময়ের গবেষণার অভিজ্ঞতায় আমার মনে হয় ভট্টশালী অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ একজন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ছিলেন।

লেখক পরিচিতি

আবুল ফজল, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

সিরাজুল হক, প্রফেসর ইমেরিটাস, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আবদুল করিম, প্রফেসর ইমেরিটাস, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

এ. বি. এম. হোসেন, প্রফেসর ইমেরিটাস, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

বসন্ত চৌধুরী, মুদ্রাতত্ত্ববিদ, অভিনেতা ও কোলকাতার প্রাক্তন শেরিফ

আনিসুজ্জামান, প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কে. এম. নূরুল হুদা, প্রফেসর, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ইমরান হোসেন, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

গোলাম কিবরিয়া ভূইয়া, প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, টিভি উপস্থাপক ও মিডিয়া বিশেষজ্ঞ

শামসুল হোসাইন, উপ-কিউরেটর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জাদুঘর।